বরনারী

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী

চিত্ত মিত্র ও আম্নু মিত্রকে

এই লেখকের :

কন্যকা

কলাবতী

নহবৎ

●

গল্পক্রম

বরনারী। প্রধান অতিথি। মা-র বাপের বাড়ী। মনের ব্যাধি। মরণ। হে রবিঠাকুর। নিঃ বাঃ বঃ সাঃ সঃ। এ সপ্তাহটা কেমন যাবে। গঙ্গাযাত্রা। প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে। আত্মহত্যার পরে।

বিয়ে করব ঠিক করে ফেললাম। আমার নিজের তেমন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কি করি মা-র বয়স হয়েছে, সংসারের কাজ কর্মে তাঁর একটি দাসী দরকার। তাছাড়া মা নাকি মাঝে মাঝে ওপারের ডাক শুনতে পান, তাই খেয়া পার হবার আগে পুত্রবধূর মুখ দেখে যেতে চান। পরিবার-পরিকল্পনার যুগে নাতির মুখ দেখবার আশা এ কালের মায়েরা ছেড়েই বসে আছেন। সে-দুরাশা নয়, শুধু বৌয়ের মুখ। বৌয়ের মুখ দেখার জন্য আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, একথা খুব চড়া গলায় কড়া করে শুনিয়েও শুধুমাত্র মার মুখ চেয়ে বিয়েতে আমি রাজী হলুম। আমার আশা ছিল, কোন এক শুভ লগ্নে কোন একটি রূপসী কন্যা আমার দরজায় এসে দাঁড়াবে, এবং গদগদ ভাষণে প্রেম নিবেদন করবে। কতদিন রাস্তা চলতে কত মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছি, হৃদয়ের সবকটা প্রকোষ্ঠ একসঙ্গে তাদের ল্যাব-ডুপের মধ্যে 'ঐ এলো ঐ এলো' বলে কোরাস্ গেয়ে উঠেছে। কিন্তু আমার ল্যাব্-ডুপের সঙ্গীতের সঙ্গে তাদের হাই—হিল জুতো জোড়া খটাখট সঙ্গত করতে করতে ক্রমে দূরে মিলিয়ে গিয়েছে। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছি, 'অরে এ সে বরনারী নয়।' হতাশ হইনি আমি। কবিগুরুর বাণী আমায় পথ দেখিয়েছে, 'অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' আমার সেই বরনারীকে আমি গরু-খোঁজা করেছি। প্রতীক্ষা করেছি দীর্ঘকাল—তিরিশটা বছর। কিন্তু সব কিছুর একটা সীমা আছে। সেটা পার হয়ে গেলে না চটে উপায় থাকে না। আমিও বিলক্ষণ রেগে গেছি সেই অপরিচিতা মেয়েটার ওপর। কথা দিয়ে কথা না রাখলে যেমন ধরণের রাগ হয়, অনেকটা তেমনি। এদিকে আমার বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেল, তাঁর কিন্তু টিকিটির—থুড়ি, বেণীটির—দেখা নেই। বেশ, আসতে হবে না, দরকার নেই আমার। আমিও মরদ। হ্যাঁ, আমিও একটা কিছু করে ফেলতে

পারি। বিয়ের সিদ্ধান্ত সেই জন্যে করলাম। এর পরে তাঁকে এনে সতীনের ঘর করতে হবে। প্রতিশোধের সংকল্প নিলাম আমি। প্রাক-বিবাহ পূর্বরাগে কার একটু সখ না থাকে! কিন্তু এ মেয়েটা আমার সেই সখের গুড়ে বালি দিয়ে দিলে। এ জীবনে আমার আর পূর্বরাগের পালা এল না। জীবন আমার পূর্ণ হোল না। এই অপূর্ণতার জন্য যে দায়ী, সেই মেয়েটিকে আমি চিনি না অবশ্য (চিনলে তো ল্যাঠা চুকেই যেত), তা সত্ত্বেও তাকে অভিশাপ দিলাম, এবং পুরুষের মত বীর পদক্ষেপে চলে এলাম সোজা 'মাল্যবদল প্রতিষ্ঠানে'। ওটা দু'হাত এক করবার একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। সাদা কথায়, ঘটকের অফিস বা বিয়ের দালালের 'গদি'। কিন্তু বাঙ্গালীর ব্যবসার ভাঁড়ে যাই থাক না, নামকরণ আর অলংকরণটি সুন্দর চাই।

'মাল্যবদল' অফিসে তখন মাল্যবদলানেওয়ালা স্বয়ং বসে ছিলেন। তাঁকে দেখেই আমার সেই ছড়াটা মনে পড়ল: 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে'। ছ' ফুট লম্বা একটি দেহ শুধু কাঠ দিয়ে তৈরি—স্রেফ কাঠ, আর কিছু নয়। কাঠের ওপরে পাতলা একটা চামড়া রঙের কাগজ সাঁটা। চুলগুলোও কাঠের তৈরি। খুব সরু সরু কালো-সাদা ছুঁচোল কাঠ, অর্থাৎ কাঠি। শোয়া-বসা-নোয়া জানে না সেগুলো—এক ব্যাটালিয়ান সেপাইর মত খুব সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে আছে, সেনাপতির হুকুম আসবা-মাত্র মার্চ করে মস্তক পরিত্যাগ করে দল বেঁধে অন্য কোথাও ছুটে চলে যাবে। আমি কল্পনার চোখে সেপাইহীন সেই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডটা প্রত্যক্ষ করছিলাম, অকস্মাৎ সেপাই সমেত সেই মাঠটা নড়ে উঠল। শব্দ হোলো একটা: 'কি চাই ?'

'মেয়ে।'

মেয়ে ?

'মানে পাত্রী—বিয়ের।'

'কি রকম পাত্রী চাই।'

'এই—সুন্দরী। বিদুষী। গান-বাজনা জানবে। আর—'

'আহা ওসব তো পরে। আমি বলছি, কি জাতের পাত্রী চাই। এটা একটা ইনটারন্যাশনাল কনসার্ন। কি চান—? বাঙ্গালী? মারাঠী? পাঞ্জাবী? বা উড়ে?'

'না, না। ও সব চাই না।'

'তবে? অভারতীয় চান? খাস ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, চাইনীজ, হাবসী সব পাবেন। তাছাড়া মিক্সড্ পাবেন। অ্যাংলো—ইণ্ডিয়ান, অ্যাংলো—চাইনিজ, চীন-ভারত, ইণ্ডো-চাইনীজ, জ্যাপ্‌নীজ, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, বার্মিজ—।'

'না না, আমার ওসব চাই না।' আমার হাঁপ ধরে গিয়েছিল—শুধু শুনেই। রোগা, লম্বা ও হলুদে দাঁত বার করে হাসলেন ঘটকপ্রবর: 'হেঁ হেঁ হেঁ:। মিক্সডে আপত্তি। নৃতত্ত্ব অবশ্য বলে, আমরা সবাই মিক্সড্। যাই হোক, বলুন কি রকম চাই আপনার।'

'বাঙ্গালী।'

ভদ্রলোক যেন হতাশ হলেন তাঁর ভূ-প্রদক্ষিণ এবং নৃতত্ত্ব-চর্চার মুক্তো উলুবনে পড়েছে দেখে। বললেন, 'বাঙ্গালী! কি রকম— ?'

'ঐ যে বললাম। সুন্দরী, বিদু— ?'

'আহা, ওসব তো পরে। কি জাতের চান—মানে কি বর্ণের?'

'নাকি অসবর্ণে আপত্তি নেই।'

'কায়স্থ।'

'অ বেশ কোন্ গোত্রের জন্যে?'

'আজ্ঞে, বুঝতে পারলাম না ঠিক।'

'কে বিয়ে করবেন—পাত্র কে?'

'কেন—আমি।' বেশ জোর গলায় বললাম। ভদ্রলোক আমার বিবাহযোগ্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করছেন না তো! 'আমি বিয়ে করব।'

'আপনার কি গোত্র?'

এক ঝাঁক মুনির নাম আমার মনের মধ্যে ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দিল—সব মুনিই সবচেয়ে আগে আমার জিভে চড়ে শব্দব্রহ্ম হয়ে যেতে চায়।

কিন্তু কে যে এর মধ্যে আপন তা খুঁজে বার করতে পারলাম না অত ভীড়ে। অগত্যা বললাম, 'বাড়ীতে মার কাছে জিজ্ঞেস করে পরে বলব।'

'বয়স কত হোলো ?'

চটে গেলাম : 'দেখুন গোত্র মনে নেই তাইতে ওরকম ব্যঙ্গ করবার কোন অধিকার আপনার নেই।'

'আপনি ভুল বুঝছেন। আমি কোন ঠাট্টা করিনি। সত্যি-সত্যি বয়স জানতে চাইছি।'

'তিরিশ।'

'তাহলে, আপনার কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে হলেই সুবিধে হয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু ডাগর-ডোগর চাই। মানে, সংসারের কাজকর্ম করা—বুঝতেই পারছেন, ছেলেমানুষে কি করে চলবে ?'

একটি মোটা খাতা সামনে টেনে এনে তার পাতাগুলোতে তর্জনী-পথে থুথু ছড়াতে ছড়াতে ঘটকপ্রবর বললেন, 'কায়স্থ কি আপনি কুলীন চান ? ঘোষ, বোস, গুহ, মিত্র—এই চার ঘরের মধ্যে ? আর একটু নিচে মানে মৌলিকে নামতে আপত্তি আছে ?'

'বিন্দুমাত্র না।'

'ঠিক বলেছেন। স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।'

'অবশ্য স্ত্রীরত্নটি কায়স্থের নিচে হলে আপত্তি আছে। ওপরে হলেও। মা-র আপত্তি।'

ঘটকপ্রবরের দক্ষিণ তর্জনী জিভ ও খাতার পাতার সঙ্গে অনবরত সম্বন্ধ স্থাপন করে ক্লান্ত হয়ে একটু থামল। জিভটা আঙুল চাটা বাদ দিয়ে এবার সশব্দ হোলো : 'হ্যাঁ, বরানগরের এই মেয়েটি। সব দিক দিয়েই আপনার সঙ্গে বেশ—'

'আজ্ঞে সুন্দরী তো ?'

ঘটকপ্রবর হঠাৎ থামলেন আর জ্বলন্ত ভৎর্সনার চোখে আমার দিকে তাকালেন। যেন কি ভয়ংকর একটা অপরাধ করে ফেলেছি।' কিন্তু অপরাধটা কি ?

ঘটক বললেন, 'দেখুন, আমাদের 'মাল্যবদলে' সুন্দরী ছাড়া কোন মেয়ের নাম রেজিষ্টীই করা হয় না। এই তো কালকেই বালীগঞ্জের এক ভদ্রলোক এসেছিলেন—তাঁর মেয়ে মাঝারি গোছের দেখতে। বললুম—এ কেস তো আমি নিতে পারব না। ভদ্রলোক কান্নাকাটি করে হাতে পায়ে ধরলেন। খুবই কষ্ট হোলো তাঁর জন্যে, কিন্তু কিছু করতে পারলাম না। কি করব বলুন, প্রিন্সিপ্‌ল্ ইজ প্রিন্সিপ্‌ল্।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

'না, দুঃখের কিছু নেই। আপনি এত সব জানতেন না। আপনি মাল্যবদলের প্রেষ্টিজে ঘা দিয়ে ফেলেছিলেন, তাই—। যাক্‌গে, এই টালার মেয়েটা আপনার পক্ষে বেশ ভাল। বাপের লাখ খানেক টাকার সম্পত্তিও আছে।'

'আর সুন্দরী তো বটেই। দিন লাগিয়ে এটাই।'

'কিংবা গোলপার্কের এইটা। মে ভাল গাইয়ে। এম,এ। একমাত্র মেয়ে বাপের। বাপ বেশ বড়লোক।'

'আর আপনার মেয়ে তো সুন্দরী হবেই। তাহলে বরং এটাই।'

'আরো কয়েকটি ভাল মেয়ে রয়েছে দেখছি। বিদুষী ও ধনবতী। কয়েকটি আবার বিশেষ গুণবতী।'

'এত মেয়ের মধ্যে তো আমি দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি।'

'সে কি, এখনি দিশেহারা হলে চলবে কি করে! মেয়ে চোখে দেখলে তখন কি হবে। এ তো মেয়ে নয়, শুধু খবর। আসল মেয়ের বেলায় মাথা ঠিক রেখে বেছে নেবেন।'

'সেই ভাল। কবে মেয়ে দেখতে যাব?'

'আপনার নামটা আগে রেজিষ্ট্রী করুন।'

'করে নিন। পুরো নাম লিখুন—শিশিরকুমার বসু। ঠিকানা, পঞ্চান্নোর চারের—লিখছেন না কেন?'

'রেজেষ্ট্রী করার ফি-টা দিন।'

'ফি!' পাথুরে মাটিতে খচাং করে পা ঠেকল আমার।

পা-জোড়ার পাখা হওয়া বন্ধ তো বটেই। মাটিতেও যেন ঠিকভাবে চলতে পারছে না—চলেছে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে। জিভটার সেই মুহূর্তের তোতলামি ঐ ছেঁচড়ে চলারই প্রতিফলন। কোনরকমে বললাম, 'কত ?'

'পঞ্চাশ।'

'পঞ্চাশ!' না, অজ্ঞান হইনি। কেরানীর বিশেষণ শুধু মাছি-মারা হওয়া উচিত হয় নি, কাছিম-পরাণ হওয়াও উচিত ছিল। মাছি মারা ব্যাপারটা দুরূহ তা যে কোন মাছি-শিকারীই জানেন। সুতরাং ঐ বিশেষণ আমাদের গৌরব বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্বিতীয় বিশেষণটা না হলে আমাদের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না।

ঘটক মানুষ চরিয়ে খান (পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে 'চড়িয়ে, লিখলেও অর্থের ইতরবিশেষ হোতো না)। তিনি বুঝেছিলেন যে কাছিমের পরাণটা বেরোয় নি, কিন্তু অতি লম্বা গলাটা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। বোধহয় সেটাকে টেনে বার কববার জন্যেই বললেন, 'পচিশ আগাম দিলেই নাম রেজিষ্ট্রী হবে। বাকিটা দেবেন শুভকাজ স্থির হলে।'

ঘটকপ্রবর জানে না যে কাছিম একবার ঘা খেয়ে গলা ভেতরে ঢুকিয়ে নিলে আর সহজে বার করতে চায় না। আর আমি তো গলা কিছুতেই বার করব না—খাঁড়ার মুখে গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে লাভ কি। বললাম, 'তাহলে পরে রেজিষ্ট্রী করব। অত টাকা সঙ্গে নিয়ে আসি নি। তাছাড়া মার সঙ্গে একটু কথা বলতে হবে। জানেন তো লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না আমাদের দেশে। আচ্ছা, নমস্কার।'

'শুনুন। আমার কন্‌সালটেশন ফি-টা—!'

'পরে হবে।' বলেই পদযুগলে গতি দিলাম। বলা বাহুল্য, সে-গতি মোটেই কচ্ছপ-গতি নয়।

বিপদ-সীমা পেরিয়ে এসে সেই আমার অজ্ঞাতকুলশীলা অনির্দিষ্টা অনাগতা বরনারীকে মনে মনে খুব বকলাম, 'তোমার জন্যেই তো আমার এই মুস্কিল। তুমি যদি গুটি-গুটি এসে পৌঁছতে, তবে আর আমায়

এ ঝামেলা পোয়াতে হোতো না। একে তো লভ্ ম্যারেজ-গর্বিত বন্ধুদের কাছে নিজের অক্ষমতায় মুখ দেখাতে পারি না, সেই এক বড় মনঃকষ্ট। তার ওপর এইসব ঝামেলা। বন্ধুরা তো আর বোঝে না যে আসল দোষটা তোমার, হে ছলনাময়ী! নইলে আমার অক্ষমতা কোথায়? চেহারায়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, প্রতিভায়, কথায়, খেলায়, রসিকতায় আমি তো একটা অল-রাউণ্ডার।'

ঠিক এই কথাগুলি একই নারীকে উদ্দেশ্য করে আবার আমায় বলতে হোলো সাত শো সাতান্নখানা চিঠির বস্তার সামনে বসে। 'মাল্যবদল' থেকে বেরিয়ে কাগজে 'পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। তার প্রবল সাড়া মিলেছে—ডাকবিভাগ লাল হয়ে গেল। আমি সেই সাড়ার প্রবলতায় হিমসিম খেয়ে গেলাম। মাথা করতে লাগল ঝিম-ঝিম। তখন আমি আমার সেই তাকে আবার বকলাম। এতগুলো চিঠির মর্ম উদ্ধার করতে যে পরিমাণ ঘর্ম ব্যয় হবে, তাতে একখানা গোটা এন্সাইক্লোপিডিয়া গলাধঃকরণ করা যায়।

তবে আমার চাহিদা দেখে একটু পুলকও হোলো। পুলকের আরো একটা কারণ ছিল। এই সাত শো সাতান্নর মধ্যে যে সে নেই তাই বা কে বলল! প্রতিটি চিঠি ধরি, আর যেন তারই স্পর্শ পাই। কিন্তু কোনটা যে ঠিক তার, তা ধরতে পারি না।

চিঠিগুলো বিচিত্র। তাদের আকার, প্রকার, রং ঢং, ভাষা, আশা, লেখা, রেখা, কালি, কলম নিয়ে খুব সহজে একটা রম্যরচনার মহাভারত লেখা যায়। কিন্তু আমি লেখক নই। রম্যরচনার মত দুরূহ ব্যাপার তো দূরের কথা, আমার সেই নারীকে এ যাবৎ একটা পত্র পর্যন্ত লিখিনি। (নিছক নাম ঠিকানার অভাবে অবশ্য)।

দুটি চিঠি এর মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট। এই দুটির লেখিকা পাত্রীরা স্বয়ং। বাকিগুলি অভিভাবকদের। ঐ চিঠি দুটি পাওয়া মাত্র আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে আমার বরনারী এই দুটির একটি। তার বুদ্ধি দেখে অভিভূত হলাম। কী আশ্চর্য কৌশলে

সে সাত শো সাতান্নর অরণ্য ভেদ করে আমার সামনে আবির্ভূত হোলো।

মানি, এখনও দুই। কিন্তু কোথায় সাতশো সাতান্ন, আর কোথায় দুই। এ যেন বৃহৎ পরিবারের বৌ বাড়ির সাতাশ জন আত্মীয়কে এড়িয়ে নির্জনে বরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

দুয়ের কোন্‌টা—এ প্রশ্ন আমার সামনে আছে ঠিকই। কিন্তু এ ধাঁধাঁয় আমার বরং বেশ মজাই লাগছিল। যেন সেই বরনারী পৌঁছে গেছে আমার কাছে, শুধু শেষ মুহূর্তে দুষ্টুমি করে বিচ্ছেদটাকে একটু জিইয়ে রাখছে মিলনকে মধুরতর করবার জন্যে। আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সে ঐ দুটো নামের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমায় খেলায় আহ্বান করছে, বলছে, 'এসো তো দেখি তোমার কত বুদ্ধি। বার কর তো আমায়। আমি কে ? বিশাখা মিত্র না শিউলি গুহ ?'

সত্যি, নাম দুটোই এত ভাল যে কোনটাকেই অগ্রাহ্য করা যায় না। হোতো যদি একটা নাম বৃন্দাবনী ঘোষ, বা ভগবতী দে কিম্বা বিপুলা দত্ত, কত সহজে সে-নাম বাদ দেওয়া যেত। কিন্তু বিশাখা বা শিউলি কেউ এত সহজ-ত্যজ্য নয়।

লেখা দু' জনেরই এত ভাল যে এরা বরাবর হাতের লেখার প্রাইজ-পাওয়া মেয়ে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ লেখা যে চম্পককলির মত অঙ্গুলি ছাড়া বেরোতে পারে না তাও জোর গলায় বলা যায়। আর এমন আঙ্গুল তো শিল্পীদেরই মাত্র হয়, সুতরাং আমার সে বরনারী গাইয়ে, বাজিয়ে, নাচিয়ে, আঁকিয়ে এরকম একটা কিছু হবে, অথবা ঐ সবগুলি একাধারে। ভাষা দেখে তো মনে হয় লিখিয়েও হতে পারে। তাছাড়া লেখার মধ্যে অঢেল বিদ্যাবুদ্ধির ছাপ রয়েছে। দুজনে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভাল হয়েছে—শুধু আমায় মুস্কিলে ফেলবার জন্যে।

আমি হারলাম আমার সেই বরনারীর কাছে। মনে মনে বললাম, 'হার মানছি, তোমার কাছে হেরেও আমার আনন্দ। কোনটি তুমি তা বার করতে পারলাম না। এবার তুমি বল।'

সে চাপা ভ্রূকুটিতে কপট ক্রোধ দেখাল। বলল, 'আচ্ছা আলসে মানুষ বাপু তুমি। কেন, একটু উঠে এসো না। ছাখো না দু-জনকেই। দেখেও চিনতে পারবে না? জন্ম-জন্মান্তরের চেনা মেয়েকে চোখে দেখে ঠাওর করতে পারবে না?' দুষ্টু হেসে দাঁতে ঠোঁট চেপে সে বলল, 'এতেও যদি না পার, তবে থাক, চিনতে হবে না আমায়। এ জন্মের মত আড়ি থাক। পরের জন্মে—'

আমি আকুল হয়ে বললাম, 'না, না, পরের জন্ম পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারব না। এ জন্মেই চাই আমি তোমাকে। কালই যাব দেখতে।' সে সারামুখে সেই দুষ্টু হাসিটা ছড়িয়ে হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকতে ডাকতে মিলিয়ে গেল: 'তবে এসো, এসো।'

পরদিন এক প্রসন্ন গোধূলি লগ্নে বিশাখা মিত্রের দরজার কলিং বেল্ টিপলাম। বোতামের ওপর দাঁড়িয়ে আমার আঙ্গুল কাঁপছিল। যখন ভিতর-বাড়িতে রিনি রিনি করে বেল্ বাজল, আমার স্নায়ুর তন্ত্রীতে তখন সেতারের ঝালা ঝংকৃত হয়ে উঠল। পূর্বরাগের উন্মাদনা কাকে বলে মজ্জার মধ্যে জানলাম সেদিন।

একজন মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা আমায় অভ্যর্থনা করে বসালেন। স্থূলা। বর্ণ—বাবা-মা বললে শ্যামই বলবে। বিশাখা মিত্রের সঙ্গে এই ভদ্রমহিলার কি সম্পর্ক তাই ভাবতে চেষ্টা করছিলাম আমি। মা? আমার শাশুড়ী? প্রণাম করতে ইচ্ছে হোলো। কিন্তু সেটা বড় অশোভন দেখাবে। ঠিক আছে মা, পরে ডবল করে পুষিয়ে দেবো। অথবা বড় দিদিও হতে পারেন ইনি, তাও ভাবলাম।

কিন্তু অবিলম্বে সব চিন্তা-ভাবনার নিরসন হোলো। কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল এই ভদ্রমহিলাই বিশাখা মিত্র, স্কুল-শিক্ষয়িত্রী। আরো জানা গেল যে বিশাখা মিত্র আমার বড়দির (যাঁর মেয়ের বিয়ের কথা চলছে) সহপাঠিনী।

বেরিয়ে এলাম। তখন কলকাতার গোধূলি মরে গেছে। ঘন অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকারেও আলোক-রশ্মি আছে। শীত এলে বসন্ত আসতে

আর দেরি নেই। বিশাখা-সংবাদে শক্ পাইনি বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু অতি-দ্রুত সেটা কাটিয়ে ওঠা গেল। বরং খুব খুশীই হলাম আমি। কারণ এখন নিশ্চিত জানা যাচ্ছে যে আমার সেই বরনারীর নাম শিউলি গুহ। সন্দেহাতীত। অভ্রান্ত। অব্যর্থ। 'শিউলি, শিউলি, শিউলি'—নামটার গুঞ্জন সারা মনে।

আমার সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বললাম, 'পেয়েছি—আমার সেই বরনারীকে। যার কথায় তোমরা আগে হেসেছ, আজ তাকে দেখাব।'

সবান্ধবে এলাম শিউলি গুহর বাড়িতে। ভৃত্য বসাল আমাদের। অবস্থাপন্ন গৃহ। দামী আসবাব। ঝকঝকে তকতকে। যথারীতি আমার বুক কাঁপতে লাগল। না, যথারীতির চাইতেও বেশী। কারণ এ যে অমোঘ, নিশ্চিত।

ঘরে এসে ঢুকলেন দুটি মহিলা। সামনের জন খুব লম্বা, দোহারা চেহারা। বয়স অনুমান করা অসম্ভব। ময়দার মত পুরু রঙের কোটিং-এ সারা দেহ এমনভাবে মোড়া যে সে-দেহের বয়স এখন কত তা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা এলেও বলতে পারবেন না। ঐ একই কারণে বর্ণচোরা। পোষাক-পরিচ্ছদে চলনে-বলনে আধুনিকতার লেটেস্ট নমুনা—১৯৫৯-এর মডেল। জিজ্ঞেস করলেন, 'শিশির বসু কার নাম?'

'আমার।'

বন্ধুকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইনি?'

'বন্ধু।'

'নমস্কার। আমার নাম শিউলি গুহ। আপনারা চা খেতে খেতে এই কাগজটা দেখুন। একটু বাদেই আমি ডেকে পাঠাব।'

'কাগজ!'

'হ্যাঁ। এতে আমার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য সব তথ্য দেওয়া আছে।'

সঙ্গের তরুণী সহ শিউলি গুহ ভেতরে চলে গেলেন।

চা খেতে খেতে কাগজটিতে চোখ বোলান গেল। শিউলি গুহ

কোন এক সরকারী বিভাগের উচ্চ শ্রেণীর অফিসার। আরো অনেক তথ্য সংকলিত ছিল সে-কাগজে।

ইতিমধ্যে ডাক এল—শুধু আমার। বন্ধু-বিরহিত অবস্থায় এত একক নিজেকে আর কখনও মনে হয় নি। যে-ঘরে গিয়ে ঢুকলাম, সেটা পূরো দস্তুর একটি অফিস-ঘর। তার বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবলে মধ্যমণির আসনে শিউলি গুহা।

'বসুন।'

একেবারে মুখোমুখি বসতে হোলো। শিউলি গুহা তখন আমায় খুঁটিয়ে দেখছেন। আমি চোখ নামালাম।

'না, না, এখন লজ্জা করবার সময় নয় মিঃ বাসু। পরস্পরকে দেখবার চেনবার জন্যেই আমাদের এই ইণ্টারভিউ। সুতরাং আমি আপনাকে যতটা খুঁটিয়ে দেখছি, আপনিও আমায় ততটাই দেখুন। এ সময় ভদ্রতা করবেন না। ভদ্রতা করবার অনেক সময় পাবেন। এটা ঠিক ঐ ধরণের ভদ্রতা করবার সময় নয়। শুনুন, এই মেয়েটি এখানে আমাদের কথাবার্তার সময় থাকলে আপনার কোন আপত্তি নেই তো! মেয়েটি আমার স্টেনো—তথা পি. এ.। ও থাকবে আপনার detail-গুলো নোট করবার জন্যে।'

'না, না, এতে আর আপত্তি কি!'

প্রথম প্রশ্ন: 'কি চাকরি করেন আপনি?'

'ক্লারিকাল।'

'কোথায়?'

বললাম অফিসের নামটা।

'রেমুনারেশন?'

'দু-শোর কিছু বেশি।'

'বেসিক?'

'না। সব মিলিয়ে।'

'আর কোন ইনকাম আছে?'

'না, এক-আধ সময় টুইশনি—'

'লেখাপড়া কতদূর ?'

'বি-এ।'

'তারপর আর পড়েন নি কেন—অনিচ্ছা না অর্থাভাব ?'

'না—মানে—।'

'পরিষ্কার করে কথা বলুন।' সুরটা প্রচ্ছন্ন ধমকের।

'ইয়ে—বাবা মারা গেলেন তখন।'

'বাড়িতে এখন কে কে আছেন ?'

'বিধবা মা, ভাই, বোন, আমি।'

'চাকার-বাকর নেই ?'

'আজ্ঞে না।'

'বাড়ির কাজকর্ম রান্নাবান্না কে করে ?'

'মা। বোনও মাঝে মাঝে—'

'বোনের বয়স ?'

'বছর কুড়ি।'

'কি করে ?'

'কলেজে পড়ে।'

চিন্তিতভাবে বললেন, 'বিয়ে হয় নি—হুঁ।'

'আজ্ঞে না। চেষ্টায় আছি।'

'ভাই কি করে ?'

'সেও কলেজে পড়ে।'

'হুঁ—দুটো পড়ার খরচা।'

'ইনস্যুরেন্স্ আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কতোর ?'

'দু' হাজার।'

'ক' বছরের।'

'পঁচিশ বছরের।'

'ক' বছর হয়েছে।

'দেড় বছর।'

'বাড়ি নিজেদের, না ভাড়াটে ?'

'নিজেদের।'

'কার আমলের ?'

'ঠাকুর্দার।'

'জমি ক' কাঠা ?'

'তিন কাঠা।'

'ঘর ক' খানা ?

'তিন খানা—আর রান্নাঘর। একটা ঘর বসবার, আর একটায় আমরা দু' ভাই—'

'বিয়ে করলে ভাই কোথায় যাবে ?'

'ওকে ঐ বৈঠকখানাতেই ভাবছি—'

'বাড়ি তো খুব পুরোনো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা খুব বনেদী পরিবার।'

'ক' বছর অন্তর বাড়ি মেরামত করান ? শেষ কবে করিয়েছেন ?'

'আট বছর আগে।'

'হুঁ। বাড়িতে কটা আইটেম দিয়ে ভাত খান ?'

'তিন। কোন কোনদিন দুই।'

'সকাল-বিকেল কি খান ?'

'ইয়ে—রুটি—'

'হাতে গড়া ?'

'হ্যাঁ।'

'কোন বিশেষ 'হবি' আছে। মানে কোন সখ-টখ ?'

'সখ অনেক ছিল—এখনও আছে। কিন্তু—মানে—'

'স্পোর্টসম্যান ?'

'না।'

'গান-বাজনা আসে? না? অভিনয়? তাও না? নাচের কথা আর জিজ্ঞেস করে কি হবে তাহলে। ছবি-আঁকা?'

'না।'

'কোন বদ অভ্যেস আছে? ফ্র্যাংকলি বলুন। পানদোষ বা অন্য কিছু?'

'ছিঃ।'

'কোন বিশিষ্ট লোকের সার্টিফিকেট আছে কাছে? নেই? পরে প্রোডিউস করতে পারবেন?'

'চেষ্টা করব।'

'ছোটখাট কোন বদ-অভ্যাস আছে? একটা তো আছে দেখতেই পাচ্ছি। ইয়ে-মানের মুদ্রাদোষ আছে আপনার কথায়। আর কিছু?'

'না।'

'রাতে ঘুমোবার সময় হাত পা ছোঁড়েন না তো?'

'বোধহয় না।'

'হুঁ—কথায় প্রত্যয়ের অভাব। ঘুমোবার সময় নাক ডাকে?'

'বোধহয় না। মানে—'

'মানে?'

'না—ইয়ে—?'

'ইয়ে—?'

'না। আমার নাক ডাকার কথা আমায় বলেনি কেউ কোনদিন।'

'হেলথ্ সার্টিফিকেট এনেছেন?'

'আজ্ঞে না।'

'পরে প্রোডিউস করবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

'স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী?'

'নিশ্চয়ই।'

'বিয়ের পরে স্ত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো অসঙ্গত—এ কথা মানেন?'

'হ্যাঁ—তা—মানি বৈকি।'

'ফ্যামিলি প্ল্যানিং সম্পর্কে আপনার মতামত কি?'

'হ্যাঁ—তা—না—মানে—ইয়ে—মত—তা—আমার—'

'অপরিচ্ছন্ন কথা আমি অপছন্দ করি। স্পষ্ট উত্তর দিন। আপনি সন্তান চান, অথবা চান না। চাইলে কতদিন পরে?'

'হ্যাঁ—না—তা—'

'এ ব্যাপারে আপনি স্ত্রীর নির্দেশ, I mean অনুরোধ মানতে প্রস্তুত?'

'নিশ্চয়ই।'

'আচ্ছা, নমস্কার। আপনাকে অনেকটা কষ্ট দিলাম। আমাদের মতামত চিঠিতে আপনাকে পরে জানাব।'

ঘর্মাক্ত অবস্থায় বেরিয়ে এলাম।

বন্ধু সব শুনে বলল, 'তোর বরনারী কথাটার মানে এতদিনে বুঝতে পারলাম। যে-নারী স্বয়ং বর তাকেই বলে বরনারী।'

বাড়িতে এসে মার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। মা-র ঠিক করা পাত্রীকেই বিয়ে করব। মা-র সইয়ের পাঁচী নাম্নী একটি সাদা-মাটা মেয়েকে আমার গলায় ঝোলাবার জন্য মা আগে থাকতেই ঝোলাঝুলি করছিলেন। এবার সে বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল।

বিয়ের অল্প কিছুদিন পরে বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করলাম যে আমার সেই বরনারী এবং পাঁচী আসলে এক ব্যক্তি। একেই আমি খুঁজছিলাম। কিন্তু দুস্তর সমুদ্র ও দুর্গম পর্বত দেখতে গিয়ে গৃহকোণের ঘাসের শিশির বিন্দুতে চোখ পড়েনি। ভেবেছিলাম আমার সেই বরনারীকে পরে পাঁচীর সতীন হয়ে আসতে হবে। কিন্তু সে পাঁচীর মধ্যেই এসেছে। বিস্ময়ের ঘোরে জিজ্ঞেস করলাম, 'এতদিন কোথায় ছিলে?'

পাঁচী আরো বড় বিস্ময়ের ঘোরে বলল, 'কেন? চেন না আমাদের বাড়ি? পাঁচের তিন বৃন্দাবন লেন। লাল-পানা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা একতলা বাড়িটা। ওখানেইতো আমি জন্ম থেকে। জানতে না তুমি?'

'না। জানতুম না এতদিন।'

আপনারা নিশ্চয়ই খবরের কাগজের বিবৃতিতে দেখে থাকবেন যে বিখ্যাত পেশাদার প্রধান-অতিথি শ্রীবিব্রতবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় আর কোথাও প্রধান-আতিথ্য গ্রহণ করবেন না বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। আপনারা অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের সংবাদ শুনে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনাও কম হয় নি। অনেকেরই ধারণা, বয়স হয়েছে বলে তিনি তাঁর পেশা থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। কিন্তু আসল কারণটা তা নয়। সঠিক কারণটা বলব বলেই এই লেখা। সেই মর্মন্তুদ ঘটনা আমার লেখনীর দোষে হয়তো ততটা কারুণ্য-রসে অভিষিক্ত হয়ে আপনাদের নয়নযুগল সিক্ত করতে পারবে না, তবু জানবেন এ কাহিনী একটি অতি-করুণ কাহিনী। আমার অক্ষমতায় যদি কাহিনীর কারুণ্য ক্ষুণ্ণ হয়, তবু সত্য ঘটনাটা জানাবার জন্য আমায় এ কাহিনী লিখতে হবে।

একটি মাত্র ভুল, আর সেই দোষে বিব্রতবন্ধুকে অকালীন অবসর গ্রহণ করতে হ'ল তাঁর জীবন থেকে। হ্যাঁ, জীবন থেকেই। প্রধান-অতিথিগিরি করা তাঁর জীবন। প্রধান-অতিথিগিরি না করে তিনি বাঁচবেন কি করে? গায়ক গান না গেয়ে বাঁচে? কবি কবিতা না লিখে বাঁচে? মাছ জল ছাড়া বাঁচে? বিব্রতবন্ধুও যখন অবসর গ্রহণের ঐ বিবৃতিতে সই করেছেন তখন সেটা আসলে তাঁর আত্মহত্যার দলিলে সই করা।

তবু তিনি তা করেছেন। আত্মরক্ষার জন্যেই করেছেন। নিজের দেহটিকে রক্ষা করবার জন্য আত্মার অপমৃত্যুর দলিলে তাঁকে স্বাক্ষর করতে হয়েছে।

একটি মাত্র ভুল। লোকে সহস্র ভুল করেও সমাজে বহাল তবিয়তে স্ফীত বক্ষে হেঁটে বেড়ায়। একমাত্র ব্যতিক্রম হিন্দুরমণীরা—তাদের

ভুলের ক্ষমা নেই। শ্রীবিব্রতবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থাও প্রায় ঐ রমণীদের মত। তাঁর ভুলও ক্ষমা করে নি 'বাহুবল সংঘে'র সদস্যরা। এর পরে বুক ফুলিয়ে হেঁটে বেড়ানো একেবারেই অসম্ভব। বুকের পাঁজরই গেল গুঁড়িয়ে তো আর বুক ফোলানো!

কি কুক্ষণেই যে 'বাহুবল সংঘের'র নববর্ষ উৎসবে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন কথা দিয়েছিলেন!

চৈত্রের মত অফলা মাসে প্রখর তপন-তাপের মধ্যেও যখন গোটা চোদ্দ বসন্ত-উৎসবে প্রধান-আতিথ্য সেরেছেন, তখন একদিন 'বাহুবল সংঘে'র প্রোফেসর তিনকড়ি চাকলাদার তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এসে উপস্থিত।

তিনকড়ি এবং তিনকড়ি-সহচররা সবাই এল স্কুটারে চেপে। তাদের ভটভটানির ঐক্যতান এসে থামল বিব্রতবন্ধুর দোর গোড়ায়। একে একে তারা চলে এল বিব্রতবন্ধুর ঘরে।

বিব্রতবন্ধু তখন তাঁর সে—বছরের-শেষ বসন্ত-উৎসবের ভাষণের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়ে দেবার জন্য উদ্ধৃতি মুখস্থ করছিলেন। কোন কবিতাই মনে থাকতে চায় না বিব্রতবন্ধুর, তা আবার এখনকার কালের গদ্যকবিতা! আগের আমলের কবিতা তবু ছন্দের দড়ি ও যতির হুক দিয়ে মনের দেওয়ালে আটকে রাখা সহজ ছিল, এখনকার গদ্যের সহোদর ভাইদের মনে ঠাঁই দেবার জন্য হাজার আকুলি-বিকুলি করেও ব্যর্থতায় বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত এক একদিন দড়ি-কলসীর শরণ নিতে ইচ্ছে হয় বিব্রতবন্ধুর। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছানুযায়ী তিনি যে কাজ করতে পারেন নি, তা শুধু বাংলাদেশের মুখ চেয়ে। এমন একটি প্রধান অতিথির মহাপ্রয়াণ ঘটলে সে অপূরণীয় ক্ষতি পূরণ করতে দুর্ভাগা বাংলাদেশের কত শতাব্দী লাগবে বলা যায় না। বাংলাদেশকে বঞ্চিত করতে চান না বিব্রতবন্ধু, তাই তিনি দড়ি-হুক ছাড়াই ন্যাড়া খাড়া পথে আঁচড়ে কামড়ে উঠতে চান।

সেই দুঃসাধ্য সাধনার পথে প্রথম বাধা দিল ভটভটানির ঐক্যতান। কানের দরজায় এই প্রাথমিক কড়া-নাড়ার পর তারা চোখের সামনে এসে দাঁড়াল।

তিনকড়িদের পরণে টাইট ধরণের হাফ অথবা ফুল প্যাণ্ট। উর্ধ্বাঙ্গে পেশী-প্রদর্শক গেঞ্জী বা খাটো-হাতার বুশ্‌সার্ট।

বিব্রতবন্ধুর মনের মধ্যে যে গদ্য কবিতার পংক্তিগুলো উৎপাত করছিল, সেইগুলোই যেন সশরীরে আবির্ভূত।'

তিনকড়ি বজ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কার বাড়ি ?

পৈতৃক গৃহটি হারাবার আশংকায় বিব্রতবন্ধু ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'আমার!'

'দূর মশাই! আপনার সে তো দেখতেই পাচ্ছি। নইলে আপনি কি আর পরের বাড়ীতে বসে ছড়া কাটছেন আর মৌজ করছেন? বলছি, বাড়ীর মালিকের নাম কি ?'

'শ্রীবিব্রতবন্ধু বন্দ্যোপা—'

নাম বলা শেষ হবার আগেই তিনকড়ি চীৎকার করে বলল, 'ওরে টাবলু, পেয়েছি রে, এই তো সেই বিব্রতবন্ধু। হাঁা, দেখুন মশাই, আপনাকেই আমরা খুঁজছিলাম।'

বিব্রতবন্ধুর গলাবাজি-করা গলাও কেমন মিইয়ে গেল, 'কি দরকার ?'

'দরকার নিশ্চয়ই আছে। নইলে কি আর এসেছি ?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই।'

'দরকারটা হচ্ছে মশাই—আমরা ঐ ছুঁচ-সূতো সংঘের ছেলেদের মত ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে পারব না—আমরা একটি প্রধান অতিথি চাই।'

'একটি ভাল প্রধান অতিথি।'

'আজ্ঞে ভাল মানে কেমন ?'

'ভাল মানে জানেন না! এই সাদা বাংলার জ্ঞানটুকুও নেই? প্রধান অতিথিগিরি করে খাচ্ছেন কি করে ? এই বিদ্যেয় প্রধান অতিথি-গিরি করা স্রেফ এই বাংলা দেশেই সম্ভব। বিলেত হলে বুঝতেন।' বলল তিনকড়ি-সাকরেদ টাবলু।

তিনকড়ি টাবলুর মাথায় একটা আড়াই-সেরী গাঁট্টা কষিয়ে দিয়ে বলল, 'থাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে শিখিস নি ?'

টাবলুর পেশীও শক্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু নেহাৎ তিনকড়িদা বলে সে কিছু বলল না।

পলটু বলল, 'আজ্ঞে, ভাল মানে তাজা, অর্থাৎ সবুজ পুঁইশাকের মত। কিংবা ধরুন মাছ-মাংসের মত, যার মধ্যে প্রোটিন আছে। ভাল মানে, রক্তাভ রং, মাংসপেশীর মত শক্ত।'

তিনকড়ি বলল, 'থাম পলটু, ভাল মানে দুধের মত—মোষ্ট ব্যালান্স্ড্ ডায়েট্ এবং এ থেকে জেড্ পর্যন্ত সব ভাইটামিন আছে।'

বিব্রতবন্ধু বললেন, 'আমার মধ্যে কি সে রকমটা আছে!'

'না, না, আপনার চেহারার মধ্যে না থাকলেও চলবে, আপনার বক্তৃতার মধ্যে থাকলেই হবে। খুব জোরালো খুব বলিষ্ঠ বক্তৃতা চাই আমাদের।'

বক্তৃতার নামে বিব্রতবন্ধু উৎসাহিত হয়ে উঠলেন—রণদামামা শুনলে যুদ্ধাশ্বের যে রকম হয়। বললেন, 'বেশ রাজী আমি। কিন্তু আপনাদের অনুষ্ঠানটা কিসের?'

'এই যাঃ, সেইটাই বলা হয় নি মাইরি।' বলল টাবলু।

তিনকড়ি বলল, 'আমাদের বাহুবল সংঘের নববর্ষ উৎসব। সেখানে আপনাকে প্রধান অতিথি হতে হবে। আমরা প্রত্যেক বারই পয়লা বৈশাখ এটা করে থাকি। এতদিন আমরা অবিশ্যি প্রধান অতিথি-টতিথির ধার ধারিনি।'

টাবলু বলল, 'হ্যাঁ ধার ধারিনি। নিজেরাই পেশী-প্রদর্শনী আর নানা রকম কসরৎ দেখিয়েছি।'

তিনকড়ি রক্তচক্ষু তুলে বলল, 'টাবলু, আমাদের কথার মধ্যে কথা বলা কোন দেশী ভদ্রতা?'

টাবলু বলল, 'সরি।'

বিব্রতবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, 'এবারে তাহলে আপনারা প্রধান অতিথির জন্যে এত ব্যগ্র কেন জানতে পারি কি?

'নিশ্চয়ই। আপনাকে জানাতেই তো এসেছি।' ফস করে বলেই তিনকড়ির রক্তচক্ষু দেখে টক করে থেমে গেল টাবলু। এবং অন্য

দিকের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবিটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল—যেন কবির দাড়ির মধ্যে স্বর্ণসূত্র আবিষ্কার করছে।

তিনকড়ি বলল, 'দেখুন আজকাল প্রধান অতিথির খুব রেওয়াজ উঠেছে। এ যুগে যখন জন্মেছি,, তখন যুগধর্মটা আমাদেরও মানতে হবে বৈকি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, যুগকে তো অস্বীকার করা যায় না।' সায় দিল পলটু।

বিব্রতবন্ধু বললেন, 'তা তো বটেই।'

'প্রধান অতিথি ছাড়া আজকাল সভাই হয় না। তাই আমাদেরও ওটা দরকার, বুঝলেন কি না।'

'বটেই তো।'

রবীন্দ্রনাথের ছবি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে টাবলু বলল, 'ঐ ছুঁচ-শিল্প সংঘের কথাটাও বলো তিনকড়িদা।'

'ছুঁচ-শিল্প সংঘ? ছুঁচের কাজ শেখানো হয় বুঝি সেখানে?' জানতে চাইলেন বিব্রতবন্ধু।

'আজ্ঞে না।' সংশোধন করল তিনকড়ি। 'ওটার নাম আসলে সুরুচি-শিল্প সংঘ। আমরা বলি সূচীশিল্প সংঘ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের ওখানে গেলবার নববর্ষ উৎসবে গিয়েছিলাম আমি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেইজন্যে এবার আমরা এসেছি।'

'সেইজন্যে মানে?'

'আজ্ঞে, ওরা আপনাকে নিয়ে গিয়ে সংস্কৃতি সম্পর্কে বড় বেশী বাতচিত করে। আপনাকে দিয়ে দুটো কথা বলিয়ে নিয়েছে কিনা, অমনি খুব লপ্‌চপানি সুরু হয়ে গেছে। এ বছরে আপনাকে আমাদের হয়ে দুটো কথা বলতে হবে। ওদের লপ্‌চপানিটা থামাতে হবে—আর সহ্য করা যাচ্ছে না।'

পলটু যোগ করে দিল, 'শুধু আমাদের হয়ে বললেই হবে না, ওদের বেশ করে একটু ঠুকে দিতে হবে, স্যার। এ ব্যাপারে ভূভারতে আপনার জুড়ি নেই।'

বিব্রতবন্ধু এ স্তুতিতে খুশী হলেন। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হিন্দু মহাসভার মিটিংএ দাঁড়িয়ে মুসলমানের কুৎসা-গান তাঁর মত কেউ করতে পারে না, আবার মুসলিম লীগের সভায় আহ্বান পেলে হিন্দুকে জবাই করতে অপারগ নন। বামমার্গীর মাইক্ থেকে দক্ষিণীদের কতবার তিনি 'শ্রমিকদের রক্তখোর' বলেছেন, আবার ডানের সভায় বাঁয়াকে 'রুশ-দালাল' বলতে তাঁর মত কে পারে?

টাবলু ফোঁস ফোঁস করে বলে উঠল, 'আমরাই রাম-ঠোঁকা ঠুকে দিতে পারি ঐ ল্যাংপেঙে ছুঁচওয়ালাদের। আমার তো ওদের দেখলেই গুলো সুড়সুড় করে। কিন্তু থানা-পুলিশে মিলে হয়তো শেষে আমাদের আখড়াটাই তুলে দেবে, সেই ভয়ে চুপচাপ থাকতে হয়। এ জগতে কোন্ জিনিসটাই বা নিজের ইচ্ছে মত করা যায়, বলুন, স্যার। ট্যাঁড়স খাওয়া থেকে ছুঁচ ভাঙ্গা পর্যন্ত কোনটাই মনের মত ক'রে করা যায় না।'

'ট্যাঁড়স খাওয়া?' আশ্চর্য হলেন বিব্রতবন্ধু।

'হ্যাঁ, ট্যাঁডস। জানেন তো ট্যাঁড়সে কত অজস্র ভাইটামিন। অথচ খাওয়ার উপায় নেই এমন চড়া দর। আর ঐ ছুঁচও আমি একটা ঘুঁসিতে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু—' দীর্ঘশ্বাস ফেলল টাবলু।

বিব্রতবন্ধু রাজী হলেন। প্রধান অতিথি হ'তে। এবং ঠুকতে। নইলে এরাই হয়তো বিব্রতবন্ধুকে ঠুকে দেবে, যেমন তাল ঠুকছে টাবলুরা।

তিনকড়ি বলল, 'বেশ কথা তাহলে পাকা রইল। আমরা সেদিন নিয়ে যাব'খন আপনাকে।'

'না। তার কোন দরকার নেই। আমি নিজেই যেতে পারব। আপনাদের যায়গাটা চিনি।' একটু বাদে বিব্রতবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের সভাপতি কে?

'প্রফেসর বিশালবক্ষ বটব্যাল।' সকলে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সমস্বরে উত্তর দিল।

'প্রফেসর বিশালবক্ষ বটব্যাল?' চিন্তিতমুখে বিব্রতবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন 'কোন কলেজের প্রফেসর? কিসের প্রফেসর?'
'আপনি প্রফেসর' বিশালবক্ষ বটব্যালের নাম শোনেননি কি?' মর্মাহত কণ্ঠের কতগুলো আর্তনাদ শোনা গেল।
'ছি, ছি, এ যুগে জন্মগ্রহণ করে কোলকাতায় বাস করেও আপনি মান্ধাতার আমলে পড়ে আছেন দেখছি।' বলল টাবলু।
তিনকড়ি বলল, 'প্রফেসর বটব্যাল বিখ্যাত ব্যায়ামবীর। গত বছরে তাঁকে 'লৌহমানব' উপাধি দেওয়া হয়েছে। উনি আগে ছিলেন বাঁশবেড়ে-শ্রী, এখন হয়েছেন পটলডাঙ্গা-শ্রী। আসছে বছরে ওঁর ভারত-শ্রী বাঁধা। বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতায় ওঁকে পাঠাবার চেষ্টা চলছে।'
এর পরেও না চেনাটা মারাত্মক অপরাধ হয়ে যাবে বুঝে বিব্রতবন্ধু তাড়াতাড়ি বললেন, 'অ তাই বলুন। আরে হ্যাঁ, ওঁর নাম খুব জানি। বাংলাদেশে বাস করে ওঁর নাম জানব না! উনি তো আমাদের সারা বাংলাদেশের গৌরব।'
'আজ্ঞে হ্যাঁ, যা বলেছেন।' খুশী হয়ে উঠল বাহুবল সংঘের সদস্য-দের চোখ-মুখ।
ওরা উঠি-উঠি করছিল। বিব্রতবন্ধু বলি-বলি করেও দক্ষিণার কথাটা বলতে পারছিলেন না। লজ্জা হচ্ছিল তা নয়, ও বস্তুটা নিতান্ত মেয়েলি বলে পুরুষ—সিংহ বিব্রতবন্ধু ওটাকে বহু পূর্বেই পূরো ত্যাগ করেছেন। বলতে ভয় হচ্ছিল তাঁর; বাহুবল সংঘের সদস্যদের 'ফিজিক্যাল ফীট্স্'-এর নমুনা যা একটু আধটু দেখেছিলেন ওখানে বসেই, তাতে ওদের দেহে নাড়া লাগতে পারে এমন প্রস্তাব পাড়তে ভরসা পাচ্ছিলেন না, বেশ বুঝতে পারছিলেন যে দক্ষিণার প্রস্তাবটা ওদের কানের মধ্যে দিয়ে গিয়ে হাতের গুলোয় পশবে এবং গুলোর পুষ্টি সংকুচিত ও স্ফীত হয়ে উঠবে।
বিব্রতবন্ধুর দক্ষিণা নানারকমের আছে। এবং নানা ধরণে সেটা চাওয়া হয়। অনেক জায়গায় সরাসরি চেয়ে নেন। কোথাও বা যাতায়াত

খরচ বাবদ একটা চড়া মূল্য আদায় করেন। কিংবা গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'হ্যাঁ মশাই, আপনাদের এখানে ভাল জিনিষ কি মেলে?'
কেউ উত্তর দিল, 'বাসন'; কেউ—'মিহিদানা'; কেউ—'কাপড়'। তক্ষুনি শোনা যায় যে বিব্রতবন্ধুরও ঠিক ঐ জিনিসটিরই প্রয়োজন; বহুদিন থেকে তিনি ওটা খুঁজছেন। অগত্যা উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে একটা ব্যবস্থা করতেই হয়—হাজার হোক একটা প্রধান অতিথি তো!
শোনা যায় একবার কোন যায়গায় বিব্রতবন্ধুর প্রশ্নের জবাবে সেখানে উদ্যোক্তারা উত্তর দিয়েছিল, 'এখানে আর কি মিলবে পাড়া-গাঁ অঞ্চল। এখানে এক শুধু ভাল বাঁশ হয়।'
সঙ্গে সঙ্গে বিব্রতবন্ধুব বাঁশের অত্যন্ত প্রয়োজন দেখা দিল।
উদ্যোক্তারা একটু চিন্তায় পড়ল। প্রধান অতিথিকে বাঁশ দেওয়া—এ কথাটা শুনতেই কি রকম খারাপ লাগে; বিশেষ করে বাংলা ইডিয়মে 'বাঁশ দেওয়া' কথাটার যখন একটা অবাঞ্ছিত অর্থ আছে। কিন্তু প্রধান অতিথি স্বয়ং যে ক্ষেত্রে চেয়েছেন, সে ক্ষেত্রে অস্বীকার করাও যায় না; অগত্যা তাঁরা দশখানি ভাল-চাঁছা-ছোলা সুপক্ক বাঁশ পাঠালেন বিব্রতবন্ধুর ঠিকানায়। বিব্রতবন্ধু সেগুলো যথাযোগ্য স্থানে বিক্রী করে তাঁর দক্ষিণাটা ভালই পেয়েছিলেন।
এ সব তাঁকে ঠেকে শিখতে হয়েছে। বিব্রতবন্ধু লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের দেশের লোক অন্যকে খাটাতে যতটা দরাজ-দিল, মজুরীটা দেবার বেলায় ততটা নয়। বিব্রতবন্ধু যখন গলা-বুকের ক্ষয়ক্ষতির কথা মনে না রেখে বজ্রকণ্ঠে বক্তৃতা করেন, তখন তাঁর একটা পারিশ্রমিক পাওনা হয় কি না? একজন বড় গাইয়ে বিনা পয়সায় একবারের তরেও মুখ খুলবে? তবে দেশের সেরা প্রধান অতিথি পকেটে কিছু না পেয়ে মুখ খুলতে রাজী হবে কেন? কিন্তু এ সব প্রখর যুক্তি কে বোঝে—সারা দেশটারই বুদ্ধিবৃত্তি যে এখনও নাবালক স্তরে। তাই বিব্রতবন্ধুকে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ নানা উপায়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক দেশকে এই জ্ঞান দিতে হয় যে কাউকে খাটালে তার খাটুনির মজুরী অবশ্য দেয়।

কিন্তু আজকের বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞানটা কি ভাবে দেবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না বিব্রতবন্ধু। আশংকা হচ্ছিল, দক্ষিণা চাওয়া মাত্র বাহুবল-নির্ভর সভ্য ব্যক্তিরা পাল্‌টা তাঁকেই একটা শিক্ষা না দিয়ে ছায়।
'আচ্ছা, আমারা তাহলে উঠি।' বলল তিনকড়ি।
নাঃ, আর দ্বিধার মধ্যে থাকা যায় না। বিব্রতবন্ধু বলেই ফেল্লেন, 'আমার ইয়ে—দক্ষিণাটা—'
টাবলুর হাতের গুলো ফুলে উঠেছিল। কিন্তু তিনকড়ি বলল, 'সে হবে 'খন স্যার। আগে বক্তৃতাটা আপনার হোক তো।'
পলটু আরো প্রাঞ্জল করে দিল: 'আপনি ছুঁচ কেমন ভাঙ্গতে পারেন, তার ওপরে তো, স্যার, আপনার ইয়ে—'
বিব্রতবন্ধু বল্লেন, 'সে আপনাদের ভাবতে হবে না। ছুঁচবংশ ধ্বংস না করি তো আমার নাম বিব্রতবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় নয়। ছুঁচ এক একটা ধরব, আর পট-পট করে ঘাড় ভাঙ্গব। তবে কিছু অ্যাডভান্‌স্ পেলে মেজাজটা খুলতো, উৎসাহ আসতো।'
তিনকড়ি পাঁচ টাকার একটা নোট ফেলে দিয়ে বলল, 'ঐ থেকে আপনার যাতায়াতের খরচটাও চালিয়ে নেবেন। তবে দেখবেন, স্যার, বক্তৃতাটা যেন বেশ ছুঁচোলো হয়।'
'সে আর বলতে হবে না।'
'বাহুবল সংঘ' বিদায় নিল। বিব্রতবন্ধু আবার আধুনিক কবিতা মুখস্থ করার দুরূহ সাধনায় মন দিলেন। পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করেন তিনি, ফাঁকি দেন না।
কিন্তু সাধনায় বাধা পড়ল। আর একটি দল এসে ঢুকল। ললিত কণ্ঠে বলল, 'আমরা স্যার এসেছি সুরুচি-শিল্প সংঘের পক্ষ থেকে।'
বিব্রতবন্ধুর চক্ষু ছানাবড়ার আকৃতি ধারণ করল। সেই চোখে কিছুক্ষণ ধ্যাবড়া ভাবে তিনি তাকিয়ে রইলেন দলটার দিকে। দিশী ধুতি ও মিহি আদ্দির পাঞ্জাবীর মোড়কে এক এক বাণ্ডিল অস্থি। পায়ে

লপেটা বা মসৃণ পাম্প্‌সু। দু'টি উন্নত হনুর ওপরে দু'টি করে ভারী লেন্‌স। দীর্ঘ কেশরাশি সুবিন্যস্ত। ঈষৎ কুঁজো হয়ে তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে কোঁচার ডগাটা ধরা। কুঁজো হওয়ার কারণ বিনয় না ষ্টাইল, অথবা মেরুদণ্ডের শক্তিহীনতা, তা নিশ্চিত করে বলা মুস্কিল।

বিব্রতবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের সংঘে কি করা হয়?'

'আজ্ঞে, সংস্কৃতি-চর্চা, কলা-চর্চা।'

'কলা-চর্চা? কি রকম কলা?'

'আজ্ঞে, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য।'

'অ, মর্তমান বা ঐ জাতীয় কোন কলা নয়।'

নিছক পরিহাসের জন্যেই বিব্রতবন্ধু কথাটা বলেছিলেন, কিন্তু ফল হোলো উল্‌টো।

একটি ছেলে মেয়েলি ভঙ্গীতে বলল, 'যান স্যার, আপনি ঠাট্টা করছেন।'

আর একটি ছেলে অভিমানের সুরে বলল, 'স্যার, আপনারা যদি সংস্কৃতি ও কলা নিয়ে এ রকম ঠাট্টা করেন, তবে বাংলা দেশের কি হবে বলুন তো। আপনারা হলেন বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।'

বিব্রতবন্ধুকে তাড়াতাড়ি সান্ত্বনার সুরে বলতে হ'ল, 'না, না, আমি কিছু ভেবে বলি নি। আপনারা কিছু মনে করবেন না।'

'না, আমরা মনে কিছু করি নি। তবে আপনাদের মুখে অমন কথা শুনলে আমাদের বুকে বেদনা জাগে।'

বিব্রতবন্ধু ওদের ব্যথিত বুকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে সান্ত্বনার প্রলেপ মালিশ করে বললেন, 'আপনারা কলাচর্চা কি ভাবে করেন? আপনারা সকলেই কি ঐ সব কলায় পারদর্শী?'

'না, স্যার, সবাই কি ক'রে হবে? রামু আর কালী গান শেখে একটা গানের ইস্কুলে। অমল কবিতা লেখে।'

'আর বাকী সবাই ?'
'সবাই আমরা ফাংসন অর্গানাইজ্ করি।'
'আপনারা তাহ'লে কলারসিক ?
'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। সকলে তো শিল্পী হবার বরাত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। প্রতিভা তো ভগবানের দান স্যার।'
একজন নেতৃস্থানীয় কলাবিদ এগিয়ে এসে বললেন, 'আমাদের কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন, স্যার ? আপনি তো আমাদের ওখানে একবার গিয়েছেন, স্যার।'
'হ্যাঁ, একবার গিয়েছি, মনে আছে। তা এবারে কি মনে ক'রে ?'
'এবার নববর্ষ উৎসবে আমাদের ওখানে আপনাকে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করতে হবে, স্যার। না, কোন আপত্তি শুনব না। গেল বারে আপনি যাওয়াতে আমাদের ফাংসন খুব সাকসেস্ফুল হয়েছিল। সেদিন এসে কি আমরা আপনাকে নিয়ে যাব ?'
'না, না, আপনাদেব আর কষ্ট করে আসবার দরকার কি! বরং যাতায়াতের ভাড়াটা বেখে যান।'
সুরুচি-শিল্প সংঘ বুঝল, এটা বিব্রতবন্ধুব পরোক্ষে দক্ষিণা চাওয়া। অতএব দশটাকার দু'খানা নোট আদ্দির জামার পকেট থেকে বিব্রতবন্ধুর টেবিলের ওপরে রাখল।
'আপনার যাতায়াত বাবদ—'
'হেঁ হেঁ, বেশ, যাব।' পুলকটা চাপতে পারলেন না বিব্রতবন্ধু।
'একটা অনুরোধ আছে স্যার।'
'বলুন, বলুন।'
'আপনার বক্তৃতায় বাহুবল সংঘকে একটু ডাউন দিয়ে দিতে হবে।'
পুলকিত বিব্রতবন্ধু বললেন, 'কিছু ভাববেন না, এক হাজার ডাউন দিয়ে দেব। বক্তৃতায় অ্যায়সা ধোলাই দোব যে বাহুতে আর বল থাকবে না।'
'আপনি এমন সুন্দর করে কথা বলতে পারেন! এইজন্যেই তো আপনার কাছে এসেছি স্যার।'

'আপনাদের ঠিকানাটা রেখে যান তাহ'লে।'

'এবার স্যার আরো বড় যায়গায় হবে আমাদের উৎসব। এই যে ঠিকানা।'

সুরুচি-শিল্প সংঘ বিদায় নিল।

বিব্রতবন্ধু ঠিকানাটা 'বাহুবল সংঘে'র ঠিকানার সঙ্গে রেখে দিলেন।

এর পরের কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও মর্মান্তিক।

চৈত্রের বসন্ত-উৎসব শেষ হতে না হতেই অসংখ্য 'কল্' আসতে লাগল বিব্রতবন্ধুর। বৈশাখ মাসটা প্রধান অতিথিদের সব চেয়ে কর্মব্যস্ত মরশুম। প্রথম সপ্তাহটা চলে নববর্ষের ধাক্কা। তারপর সুরু রবীন্দ্র-জন্মোৎসব। বিব্রতবন্ধুরও সব মিলিয়ে ষোলোটা 'কল্' এল। এখন তাঁর পসার একেবারে উত্তুঙ্গে। সব প্রতিষ্ঠানই পেতে চায় বিব্রতবন্ধুকে। সবাই চৈত্র মাসের মধ্যেই বিব্রত-কে 'বুক' ক'রে গেল। পরে গেলে হয়তো তাঁর সময়-অভাব ঘটে যাবে।

বিব্রতবন্ধুও আকণ্ঠ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, এবং পসারটা বজায় রাখতে হ'লে ফাঁকি দেওয়া চলে না, এ সত্যটা জানতেন বিব্রতবন্ধু। অতএব ষোলোটা বক্তৃতা খেটে-খুটে তৈরী করতে সুরু করলেন। তারপরে মুখস্থর চেষ্টা।

এই অতিমানবিক সাধনা তাঁর দেহের সকল প্রত্যঙ্গ সহ্য করতে পারল না। ক্রমাগত মস্তিকের ওপর চাপ পড়ার ফলে মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে গেল।

ফলে পয়লা বৈশাখের শুভ দিনে তিনি উলটো-পালটা দুটো ঘটনা ঘটিয়ে ফেল্লেন।

ঠিকানা দুটো ছিল এক সঙ্গে—কোন্‌টা কার ঠিকানা তা গুলিয়ে ফেললেন বিব্রতবন্ধু। প্রথমে যাওয়ার কথা ছিল 'বাহুবল সংঘে'। ভুলক্রমে এসে পড়লেন সুরুচি-শিল্প সংঘের যায়গায়। কিন্তু অতিরিক্ত

মানসিক ক্রিয়াকলাপে মনটা তখন এত জড় যে তিনি ভুলটুকু ধরতে পারলেন না। তাঁর মাথায় তখন হিসেব চলছে ঃ এখানে আধঘণ্টার মধ্যে শেষ করে ছুঁচদের ওখানে, তারপরে সেখান থেকে বেনেটোলা যুবক সংঘ, তারপরে পটলডাঙ্গা তরুণ সমিতি, তারপর মা সরস্বতী ইস্কুল ইত্যাদি ইত্যাদি। আর সেই অসংখ্য ভাষণ তখন মাথার মধ্যে ভিড় করে গুঁতোগুঁতি লাগিয়ে দিয়েছে। সেই গুঁতোয় মাথার তখন স্বাভাবিক কার্যশক্তি সাময়িকভাবে স্তব্ধ। তাই বিনা দ্বিধায় ছুঁচদের সভায় বাহুবল সভার পঠিতব্য ভাষণ গড়গড় করে পড়ে গেলেন ঃ

'...বন্ধুগণ বাঙ্গালী জাতির গৌরব যদি কিছু থাকে তবে সে তার সংস্কৃতি, এই কথা লোকে ব'লে থাকে। কিন্তু সংস্কৃতির ধ্বজাধারী সেই অর্বাচীনরা জানে না যে তারা ঐ নেচে-গেয়ে ন্যাড়া নেড়ীর কেত্তন করে মরছে। ঐ সংস্কৃতিওয়ালারা বিকারগ্রস্ত। শক্তিহীন বর্বরগুলোর নিজেদের মা-বোনকে রক্ষা করার মত ক্ষমতা নেই, অথচ মুখে অতি উচ্চ ভাষণ। এই দুরবস্থাতেও তারা দেহচর্চা করে না। তাদের মনুষ্যত্ব কতদূর বিনষ্ট হয়েছে তা এই থেকেই বোঝা যায়। বাংলাদেশে সংস্কৃতির চর্চা অনেক হয়েছে, তাতে বাঙ্গালী জাতির ক্লীব হবার পথ প্রশস্ত হয়েছে, আজ শক্ত হাতে সেই বিকারগ্রস্ত বঙ্গসন্তানদের দেহ সম্পর্কে শিক্ষা দেবার সময় এসেছে। এ কাজ কঠিন, কিন্তু বাঙ্গালীকে বাঁচাবার জন্যে এ কাজ করতে হবে।...'

ছুঁচরা প্রথমে হতবাক। পরে তারা তাদের বিশিষ্ট মেয়েলি ধরণে এই সব মন্তব্য করল ঃ

'ছি, ছি, কি অসভ্য! দেহ শব্দটা উচ্চারণ করল কতবার নির্লজ্জের মত!'

'নেশা করে এসেছে বোধহয়।'

'দক্ষিণা কম হয়েছে নাকি?'

এ সব মন্তব্য বিব্রতবন্ধুর কানে গেল না। তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন বাহুবল সংঘে। পূর্বের ভুলের ফলে যা অবশ্যম্ভাবী তাই

এখানে ঘটল। তিনি অবলীলাক্রমে ছুঁচ-সংঘে কহতব্য কথাগুলি ন গড়গড় ক'রে বলে গেলেন: '...বাংলাদেশে কিছু মস্তিষ্কহীন রুচিহীন বর্বর জুটেছে, তারা বাংলার গৌরবময় শিল্পসংস্কৃতির চর্চাকে ডুবিয়ে স্বাস্থ্যচর্চা করতে চায়। হায়, এ পাষণ্ডদের বোঝাব কি ক'রে? ভগবান এদের দেহটা প্রকাণ্ড করে দিয়ে মাথার খুলির ভেতরটা ফাঁকা রেখেছেন।...'

আর বলবার সুযোগ দিল না 'বাহুবল'-সভ্যরা। এতদিন ধরে যে-শক্তি তারা সঞ্চয় করেছিল দেহের কোষে কোষে, যে-শক্তি ছুঁচ ভাঙতে গিয়েও পুলিশের ভয়ে সংযত রেখেছে, সেই শক্তিপুঞ্জ নাদির শার সৈন্যদলের মত বিব্রতবন্ধুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাঁর চেতনা লোপ পেল।

চেতনা ফিরে আসতে দেখলেন চারটে দাঁত, দুমুঠো চুল, একটা আঙুল, সিকিটা কান খোয়া গেছে। সর্বদেহ ব্যথিত, স্ফীত ও রক্তিম। চোয়াল, হাত ও পাঁজরের হাড় খণ্ড-বিখণ্ড। বস্ত্র ও চর্ম ছিন্ন।

জ্ঞান ফিরে আসতেই তাঁকে ভুলটা বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল। তিনিও সেই দণ্ডেই খবর কাগজে বিবৃতি দিলেন: 'আমি আর প্রধান অতিথি হইব না। কারণ—শারীরিক।'

মা বললেন, 'আচ্ছা আমি বাপের বাড়ি যেতে চাইলেই তুমি অমন গাঁইগুঁই কর কেন বল তো!'
শিব অর্ধনিমীলিত নয়ন পূর্ণ বিস্ফারিত কবে বললেন, 'গাঁইগুঁই ? মানে কি ? ও শব্দ তো এর আগে কৈলাশে শুনিনি।'
'শুনবে কোথা থেকে ? ও আমার বাপেব বাড়ির কথা।'
'বাঃ আমার শ্বশুরবাড়ির দেশে এত সুন্দর অশ্রুতপূর্ব্ব কথা যে আছে তা তো জানা ছিল না।'
'হ্যাঁ, এ তোমার কৈলেশ নয়।' বাপের বাড়ির প্রশংসায় মার মুখ আলো হয়ে গেল। এই আলোই মা-র বাপের বাড়ির দেশের ছবি-ছাপিয়েরা তাঁর মুণ্ডুর চারদিকে থালা আকার জ্যোতিতে দেখিয়ে থাকে।
শিব আবার চোখ বুজে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি তো এক পায়ে দাঁড়িয়ে। বলি, ওরা খবর পাঠিয়েছে কিছু!'
'পাঠিয়েছে। শোনোনি, মহালয়ার দিন, ভোরবেলা আমার বাপের বাড়ির বেতার-কেন্দ্র থেকে নাকী সুরে একটা লোক "মা এসো, মা জাগো" রব ছেড়ে হাঁক দিচ্ছিল। আমার তো তাইতে ঘুম ভেঙে বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল।'
'কাঁচা ঘুম ভাঙ্গলে অমন হয়। কিন্তু আমি তো সে নাকী সুরের ডাক-'হাঁক শুনিনি।'
'তুমি শুনবে কি করে—যা দম দিয়ে ঘুমোও।'
'ছ্যাখো গিন্নী, বাজে কথা বোলো না। আজকাল নেশা তো ছেড়েই দিয়েছি। আবগারী যা কড়াকড়ি। তবু নন্দী ভৃঙ্গী কালোবাজার থেকে কিছু যোগাড়-যন্তর—'
'থাক ও কথা।'

'আচ্ছা। তোমার বাপের বাড়িতে আদর আপ্যায়নের কি রকম ব্যবস্থা হয়েছে খোঁজ পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা তোলা হচ্ছে। ওরা আমাকে অত ডাকছে শুনে আমারও প্রাণ মানছে না।'

'বাপের বাড়ির নাম শুনলে কোন মেয়েরই প্রাণ মানে না।'

'তাই ভাবছি কিসে করে যাই। দোলায় চেপে যেতেই আমার ভাল লাগে।'

এর মধ্যে ।। ছেলেমেয়ে এসে উপস্থিত। কার্তিক মিলিটারীতে কাজ করে; মেজাজটাও একটু মিলিটাবী। চড়া গলায় সে বললে, 'মা দোলা- টোলায় যেতে হয় তুমি যাও। আমি যেতে পারব না। আমবা কি কচি ছেলে?'

মা বললেন, 'বেশ চল তাহলে হাতীতে যাই।'

লক্ষ্মী বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'হ্যাঁ, ধিকিয়ে ধিকিয়ে চলবে। এক-দিনের রাস্তা যাবে সাত দিনে। এটা স্পীডের যুগ বুঝলে মা।'

গণেশ গাল ফুলিয়ে বলল, 'হাতীতে আমারও আপত্তি আছে।'

সরস্বতী হেসে বলল, 'হ্যাঁ, ওতে বাহন আর বাহমানে অনেকসময় গুলিয়ে যায়।'

গণেশ মোটা গলায় ধমক দিল, 'তুই থাম তো।'

মা বললেন, 'তাহলে নৌকোয়—'

'কেন, একটা পুষ্পক জোটে না?' কার্তিক উষ্ণ।

শিব চোখ বুজে ছিলেন এতক্ষণ, এবার চোখ খুলে বললেন, 'এক কাজ কর না তোরা। আমাব ষণ্ডরাজে চড়ে চলে যা না। যাবিও ভাল, খরচাও নেই।'

সবস্বতীর রুচিতে বাধল—বড় রুচিবাগীশ মেয়ে। বলল, 'হ্যাঃ, ষাঁড়ে চড়ে আবার কেউ কোথাও যায় নাকি।'

শিব বললেন, 'যায় কি না শুনে দেখ তোর মার কাছে। ঐ ষাঁড়ে চড়ে আমি বিয়ে করতে গিয়েছিলুম।'

মা বললেন, 'থামো, থামো, ছেলেমেয়েদের কাছে আর তোমার সে কীর্তির কথা বলে কাজ নেই।'

শেষ পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের চাপে মা হরিদ্বারের পথে ইন্দ্রপ্রস্থ পর্যন্ত একটি পুষ্পকে (ইন্দ্রের কাছে থেকে ধার নিয়ে) এসে ওখান থেকে ট্রেনে চাপলেন। নন্দীভৃঙ্গী ট্রেনে তুলে দিয়ে চলে গেল। ওরা আগে শেষ অবধি আসত। কিন্তু এখন তার দরকার হয় না, ছেলেরা 'যুগ্যি' হয়েছে।

ট্রেনে পা ফেলার যায়গা নেই এমন ভীড়। মা, লক্ষ্মী আর সরস্বতী কোন রকমে ঠেসাঠেসি করে বসতে পেরেছে। কার্তিক গণেশ ঠায় দাঁড়িয়ে। আর জান্তব বাহনদের দুরবস্থার চূড়ান্ত। বেঞ্চির তলায় গুঁজে রাখা হয়েছে লাগেজের মত। গণেশের ইঁদুরটা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে গিয়ে মালপত্রে চোট খেয়ে চিৎপটাং। সিংহ দু'একবার হালুম-হুলুম করায় যাত্রীরা ভয় পেয়ে ঝগড়া লাগিয়েছিল। মা তাদের অনেক বলে শান্ত করেছেন, 'এ সিংহ তেমন নয়। এ বড় নিরীহ

স্থূলদেহ গণেশ একবার বাংকে ওঠবার চেষ্টায় বেশ হাসির খোরাক যোগাল। সরস্বতী টেরচা চোখে ঐ কোণের একটি সুদর্শন যুবককে দেখে মুগ্ধ হল, এবং পাঁচ মিনিটে একবার করে তাকাতে লাগল। কার্তিক তার সামনের একটি মেয়েকে দু'বার দেখে তৃতীয়বার তাকাতে গিয়ে তার সিঁথে দেখে হতাশ হল।

মা সবাইকে কৈলাস-থেকে-আনা কিছু লুচি তরকারী বেঁটে দিলেন। রাস্তার খাবার খাওয়া মা পছন্দ করেন না।

গাড়ি চলছে। প্রতি ষ্টেশনে নবাগত ও পূর্বাগত যাত্রীদের কলহ এবং বিবাদ অব্যাহত। অসুরকে একদল লোক আগে পুলিশে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সে তার গুণ্ডা মাফিক চেহারা নিয়ে দ্বার রক্ষায় মনোযোগ দেওয়াতে সবাই তার ওপর খুশী হয়েছে।

শেষে হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ি থামল। নামল সবাই। একটা

লোক সরস্বতীকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। সরস্বতী বলল, 'ব্রুট।' কার্তিক লোকটার কলার চেপে ধরার আগে সে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল।

মার একদল সন্তান এসেছে মাকে নিতে। তারা উৎকটভাবে চিৎকার করে উঠল, 'দুর্গা মাইকি য়্যাঃ।'

যাত্রা শুরু হল—মণ্ডপ অভিমুখে। এদিকে বৃষ্টিও শুরু হল। কার্তিকের ময়ূর নাচতে নাচতে চলল—বৃষ্টিতে একমাত্র তারই আনন্দ।

লক্ষ্মী বলল, 'মা, গাড়ি-বারান্দার তলায় একটু দাঁড়াই, বৃষ্টি ধরুক।'

সন্তানরা তাতে রাজী নয়। তারা বলল, 'মা দয়া করে একটু ভিজেই চল মা। ওদিকে রাজ্যপাল এসে যাবেন।'

মার দয়ার শরীর। বললেন, 'চল।'

বৃষ্টির মধ্যেই সবাই চলল। একটা যায়গায় এসে দেখা গেল, রাস্তায় এক পুকুর জল। লক্ষ্মী বলল, 'এই বোধহয় ঢাকুরের লেক।'

সন্তানরা বলল, 'কাকে কি বলো গো লক্ষ্মীদি, মাইরি হেসে মরে যাই।'

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে এ যায়গার নাম কি?'

'মা, এ হচ্ছে ভারত-বিখ্যাত ঠনঠনে। তোমাদের কৈলেশে মেঘ করলে এখানকার রাজপথে জল জমে।'

'গাড়ি-ঘোড়া যে আটকে গেল।'

'তাই যায় মা। প্রাচীন বাংলায় বলা হত, জলের অপর নাম জীবন। আধুনিক বাংলায় আমরা বলি, জলের অপর নাম 'জাম্'। সরস্বতীদির সামনে অবিশ্যি আমার তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করা ঠিক হচ্ছে না। হ্যাঁ, মা, সরস্বতীদি যে ডি. ফিল.—এর জন্য রিসার্চ করছিলেন তার কতদূর? এদিকে ডি. ফিল. হয়ে এলেই স্পনসর্ড কলেজে খাসা চাকরি—দেড় শো টাকা মাইনে।'

মা বললেন, 'সে তো হল বাপু, এখন এ জল পেরোই কি করে?'

'কিছু ভাবনা নেই মা। কাপড়টা একটু তুলে নাও—হাঁটুর ওপরে মাত্র এক হাত তুললেই হবে। মেরিলিন মনরো বা এস্টার উইলিয়াম্স্-

এর মত করে চলে এসো। দাঁড়িয়ে থেকো না। ওদিকে রাজ্যপাল এসে হয়তো বসে থাকবে।'

লক্ষ্মী-সরস্বতী আধুনিক মেয়ে। ওদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। ওরা কাপড় না ভিজিয়েই পেরিয়ে এল। এমন কি কলা-বৌ পর্যন্ত তার কদলীকাণ্ড-উরু মাত্র সিক্ত করে পেরিয়ে এল—কাপড়ের মধ্যে ভিজল তার তিন হাত ঘোমটার শুধু ডগাটা। কিন্তু মা বড়ই প্রাচীন। ওঁর কাপড়ের পাড় একটু ভিজল।

মণ্ডপে এসে দেখা গেল, রাজ্যপাল তখনও এসে পৌঁছননি। সন্তানরা বলল, 'মা, একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

'কেন? রাজ্যপাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে কেন?'

'তিনি আসবেন আপনার উদ্বোধন করতে।'

'আগে তো পুরোহিতেই বোধন করতেন।'

'বোধন নয় গো মা, উদ্বোধন।'

'সে আবার কি?'

'আঃ, তুমি বড় ব্যাকডেটেড্। একটু অপেক্ষা কর। দেখতে পাবে নিজের চোখেই।'

একটা ছোট যায়গাতে মাদের সবাইকে নিয়ে একটা পর্দা-ঢাকা দেওয়া হল। বোরখা-কবলিত সবাই গরমে ভেপসে উঠল।

কিন্তু উদ্বোধনের আগে নাকি মাকে প্রকাশ্যে মুখ দেখানো বারণ, লক্ষ্মী সরস্বতীর বিরক্তির শেষ নেই। ওদিকে কার্তিক বলছে, 'আর আমি আসব না। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এখন আর আমি হ্যাংলা নেই। আমি ঐ একবার একলাই আসব।' গণেশের বারংবার শুঁড় নাড়ার অর্থ ভাষায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—আঃ, কি জ্বালা! অসুর তো এতক্ষণ পর্দাখানা ফর্দাফাঁই করে দিত—যদি না মা ওকে ত্রিশুলের খোঁচায় শায়েস্তা রাখতেন। সরস্বতীর হাঁসটা থেকে থেকে প্যাঁক প্যাঁক করছে। পর্দা-ঢাকা অন্ধকার দেখে লক্ষ্মীর প্যাঁচা রাত ভেবে 'বুবুম্—ফ্যাঁচ' শব্দে আনন্দ প্রকাশ করল। পৌর প্রতিষ্ঠান

তার ভূগর্ভস্থ নালিকায় যে শূকরোপম মূষিকগুলিকে পোষে তাদের কতকগুলিকে দেখে গণেশের ইঁদুর অবশ্য বেশ প্রসন্ন চিত্তে তাদের সঙ্গে কুশল আদান-প্রদান করতে লাগল।

হঠাৎ একটা তুমুল কোলাহল। রাজ্যপাল এলেন। পর্দা একটু ফাঁক করে মা দেখলেন। ওমা এ যে মেয়েছেলে। দিনে দিনে কি যে হল! মা তাড়াতাড়ি সরস্বতীকে বললেন, 'আর একটু ভাল করে লেখাপড়া কর, সরি, তুইও একদিন তাহলে গোষ্ঠপাল হতে পারবি।'

কার্তিক শুধরে দিল, 'গোষ্ঠপাল নয়, রাষ্ট্রপাল।'

'ঐ একই হল, আমরা মুরুখ্যু মেয়েমানুষ, আমাদের উশ্চারণ অত ভাল হবে কি করে।'

সব লোক ঘন ঘন প্রণাম করছিল। না, মাকে নয়, রাজ্যপালকে। রাজ্যপাল করতালি, স্তুতি ও তোয়াজের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এলেন মা-র কাছে, হাতে তাঁর একটা কাঁচি। মা ভেবেই পেলেন না, কাঁচি দিয়ে কি হবে। কাঁচি-চিরুনি দিয়ে অবশ্য স্বর্গীয় ক্ষৌরকার কার্তিকের চুল দশআনা-ছআনা হিসেবে ছাঁটে। (শিব ও গণেশের এবম্বিধ প্রয়োজন নেই। গণেশের হস্তীমুণ্ডের ষোলো আনা টাক, আর শিব জটাধারণের পক্ষপাতী।) কিন্তু এ ক্ষেত্রে হাতে চিরুনি ছিল না। শুধু একটা উদ্যত কাঁচি এগিয়ে আসছে—মার নাক লক্ষ্য করে। নাকের মধ্যে কাঁচির সরু ডগাটা ঢুকে গেলে এই সভামধ্যে অশোভনভাবে হেঁচে ফেলতে পারেন এই ভয়ে মা মাথাটা সরিয়ে নিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই পর্দার ফিতেটা রাজ্যপাল কেটে দিলেন। বিপুল উল্লাস-কলরোল; ক্যামেরার ক্লিক ও ত্বরিত-আলোকাভাস।

মা ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সরস্বতী বলল, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না মা। শীগগির পোজ নাও।'

মুহূর্তে মা সিংহের ওপর দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে ত্রিশূল চালিয়ে দিলেন অসুরের বুকে। অসুর তার হাতের ছোরা উঁচিয়ে ষ্ট্যাচুর মত

আধ-বসা অবস্থায় রইল। অন্যান্য সবাই যে যার পজিশন ও পোজ নিয়ে নিল—নিপুণ অ্যাক্রোব্যাটের মত।

তারপরে বক্তৃতা। রাজ্যপাল বললেন ম্লেচ্ছ ভাষায়। মা একটি বর্ণও বুঝলেন না। শুধু কতগুলি ইকড়ি মিকড়ি শব্দ—যেন কড়াভাজা ছোলার স্রোত রাজ্যপালের মুখের মধ্যে দাঁতের সংঘর্ষে এসে প্রতিরোধ করতে করতেও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

অন্যান্যরা বাংলাতেই বললেন। তাঁরা নানা ভাষায়, ভাবে ও ভঙ্গীতে রাজ্যপালকে ধন্যবাদ জানালেন, কারণ রাজ্যপাল তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করে এখানে এসে বক্তাদের ও মাকে কৃতার্থ করেছেন। এই সময় তো রাজ্যপাল কোন রাষ্ট্রভাষী চলচ্চিত্র, বা বিড়ির দোকান, অথবা পাদুকা-বিপণি উদ্বোধনের মত কোন গুরুতর রাজকার্যে নিযুক্ত থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেখানে না গিয়ে এখানে এসেছেন। এ ভক্তির তুলনা কোথায়!

রাজ্যপাল চলে যেতেই সংগঠকদের দুই দলে ঘোরতর মারামারি লেগে গেল। বর্তমান সম্পাদকের দল প্রাক্তন সম্পাদককে বলল, 'তুই শালা পাঁচ শো টাকা খেয়ে বসে আছিস।'

প্রাক্তনের দল উত্তর দিল, 'আমরা, না তোরা? অন্তত তিন শো মেরেছিস চোট্টার দল। বাজনা, পুরুত, প্রতিমার খরচ কত!'

'থাম, থাম, তোদের হিসেবটা দিই তাহলে।'

মা সরল মানুষ। মা কারুরই কথা অবিশ্বাস করলেন না। তিনি বুঝলেন, তাঁর ভাগ থেকে মোট আট শো টাকা সরে গেছে! মার দয়ার শরীর। মা ওদের মনে মনে ক্ষমা করলেন। আহা ছেলেমানুষ! প্রাক্তন সম্পাদকের বয়স মাত্র চল্লিশ বৎসর। আর বর্তমানেরটি তো আরো ছোট—বত্রিশ! মার বয়সের তুলনায় কত ছেলেমানুষ। ওটুকু লোভ তো ওদের থাকবেই!

ওদিকে দুই ছেলেমানুষের ঝগড়া মুখ থেকে হাতে এসে ঠেকল। এবং সেটা শুধু হাতে নয়। কয়েকটা সোডার বোতল মার রগ ঘেঁষে ঊর্ধ্ব

শ্বাসে ছুটে চলে গেল। আর গোটাকতক ছেলেমানুষ বোমা (অর্থাৎ অ্যাটম বোমা নয়) দুমদাম শব্দে ফাটল। দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় পর্যন্ত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। এবম্বিধ আধুনিক অস্ত্রের সঙ্গে তার পরিচয় নেই। পুলিশ এসে শেষে ব্যাপারটা থামাল।

এদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে গণেশ বলল, 'এদের আমি সিদ্ধি দেব না।'

কলা-বৌ ঘোমটার অন্তরালে নথ ঝাঁকানি দিল, 'তুমি থামো তো বাপু।'

দাঁড়িয়ে থাকাও একটা শ্রম-সাপেক্ষ কর্ম। সেই কর্মের ম্যারাথন রেস তারপর শুরু হল। ষষ্ঠী থেকে দশমীর সন্ধ্যা পর্যন্ত যথাযথ পোজ নিয়ে অর্থাৎ সিংহের পিঠে এক পা ও অসুরের বুকে এক পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা—সত্যি এ মেয়ে তো মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়। জনস্রোত আসছে, যাচ্ছে। বিচিত্র মানুষ, বিভিন্ন মন্তব্য।

একজন মেয়ে বলল, 'মার মুখখানা, ভাই, ঠিক চিত্রালি সেনের মত দেখতে।'

আর একজন প্রতিবাদ করল, 'না, বরং বোম্বাইর বিধুবালার মত। চোখ দুটো ছাখ।'

তৃতীয়ের মতঃ 'না ভাই, এ ঠিক বীণাকুমারী।'

তারপরে যত লোক আসে, সবাই মা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে কোন না কোন না 'বালা' অথবা 'কুমারী'র মত দেখতে থাকে। আর কার্তিক কুমার তো বটেই, কিন্তু উত্তম, মধ্যম না অধম—এই হচ্ছে সন্তানদের সমস্যা। অসুর আরো ভাল করে পোজ নিল। যাতে তাকে নায়ক না হলেও অন্তত ভিলেন বলে মনে হয়। কলা-বৌ ননদদের সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত হয়ে ভাবতে লাগল—'হায়, আমি যে মুখ দেখাতে পারি না লজ্জায়।' আর সিংহ মার বাছে কাঁদুনি গাইতে লাগল—'আমার কেশর কেন শাম্পু করে আনো নি।'

গণেশের এ সব দিকে মন নেই। সে ভাবছে অন্য কথা। বলিপ্রথা আজকাল এত নিরামিষ হয়ে উঠেছে যে ভোজনকার্যের আনন্দ আর নেই। অথচ মানুষ মাতুলালয়ে আসে নিশ্চয়ই শুধুমাত্র দুধু-ভাতু খাবার জন্যে নয়। কিন্তু গৌড়দেশে মধুর বদলে গুড় যদি বা চলে,

ছাগের পরিবর্তে ছাঁচি-কুষ্মাণ্ড কোন ভদ্র-সন্তান বরদাস্ত করতে পারে! শুঁড় দিয়ে গণেশ এপাশ-ওপাশ থেকে কিছু টেনে আনতে সক্ষম, কিন্তু শুঁড় দিয়ে ভুঁড়ি চুলকোনো ছাড়া অন্য কাজ করলে মা রুষ্ট হন।

প্যাঁচা একবার ডেকে উঠল: 'বুবুম্—বুবুম্—বু।' -এত বিদ্যুৎ-আলো তার সহ্য হচ্ছে না।

মা বললেন, 'রোসো, বাপু। হয়ে এসেছে। এবার আমরা যাব।'

লোকে বলে, 'মার মুখ নবমী দশমীর দিন সত্যি করুণ দেখায়। আহা, মা আমাদের ছেড়ে যেতে কষ্ট পাচ্ছে।' কেউ বা বলে, 'মার মুখে ঘামতেল মাখাবার জন্যে অমন দেখায়।'

কিন্তু আসল ব্যাপার কেউ জানে না। চার পাঁচ দিন টানা ঐ পোজে দাঁড়িয়ে থাকলে এবং অষ্টপ্রহর মাইকের 'হোলাল্লা-বেলাল্লা' শুনলে কারুরই মুখ করুণ না হয়ে পারে না। তবু মা নেহাৎ ভালমানুষ বলে রক্ষে। বাবা হলে এতক্ষণে নির্ভেজাল খাঁটি তাণ্ডব দেখিয়ে দিতেন।

দশমী। মা এবার চললেন। বিসর্জন-মিছিল শুরু হল। কতকগুলি ছেলে হাফ ফুলের মাঝামাঝি দৈর্ঘ্যের প্যাণ্ট পরে মার সামনে কোমর দুলিয়ে নাচতে লাগল। মাকে সরস্বতী বুঝিয়ে দিল, 'বোম্বাই নাচ। বড় ভাল জিনিষ।'

মা বললেন, 'কি জানি, আমাদের আমলে ভারতনাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী এই সব ছিল।'

সরস্বতী বলল, 'ওসব একদম সেকেলে। জোরে এসব বোলো না, মা, তুমি। লোকে শুনলেও হাসবে। বোম্বাই নাচের কাছে ওসব, ছোঃ! এ হচ্ছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনের সংকর নৃত্য।'

'আবার ওঁর নাম কেন বাপু! যাই বলিস, তোর বাবার নাচ কিন্তু আমার এর চেয়ে ঢের ভাল লাগে।'

'আহা, সংকরে দন্ত্য-স, তালব্য-শর কথা আমি বলছি না।'

হঠাৎ একটা ছেলে একমুখ কেরাসিন তেল পিচকিরির বেগে ছুঁড়ে তাতে

আগুন দিয়ে আলো ঝলকে তুলল। সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে চমকে উঠল মার চিত্ত। বললেন, 'আহা, ছোঁড়াটা মরবে যে!'

সরস্বতী বলল, 'না মা, ওরা মরবে না। ওরা মহামারী-দুর্ভিক্ষ নিয়ে ঘর করে। তাও ওরা বেঁচে থাকে। ধুঁকতে ধুঁকতে কাঁপতে কাঁপতে বিশ্বের সকল রোগবীজাণুর উদার আশ্রয় হয়েও ওরা বেঁচে থাকে। তোমায় অত ভাবতে হবে না, মা!'

গণেশ বলেছিল, 'ওদের অর্থাৎ মার এই সন্তানদের সিদ্ধি দেবে না। কার্য-কালে দেখা গেল একেবারে বাস্তব সিদ্ধি সন্তানরা পিপে পিপে পান করে গণেশের মুখের ওপর জবাব দিয়ে যাচ্ছে।

ঝপাং করে গঙ্গাগর্ভে ফেলতেই মা অবশ্য তার দলবল নিয়ে সিধে কৈলেশের গাড়িতে উঠলেন।

লক্ষ্মী বলল, 'মা, আমি আর তোমার সঙ্গে এখন যাব না। আমার পূজোটা নিয়েই একেবারে যাব। পাঁচদিনের মধ্যে কৈলাশে যাওয়া আসার হাঙ্গামা তো কম নয়।'

'তুই এখানে থাকবি কোথায়?'

'গ্র্যাণ্ড হোটেলে।'

সরস্বতী মুচকি হাসল। সে জানে নারায়ণ গ্র্যাণ্ডে ইতিমধ্যে ঘর নিয়ে লক্ষ্মীর জন্য অপেক্ষা করছে। নারানটা আজকাল বড় স্ত্রৈণ হয়েছে, বৌ ছাড়া একদণ্ডও থাকতে পারে না।

মা বললেন, 'পূজো হয়ে গেলেই তাড়াতাড়ি ফিরিস মা। বড় চিন্তায় থাকব। চলি, দেখি গে সে মানুষটা আবার গাঁজাগুলি খেয়ে এখন কোন শ্মশানে পড়ে আছে। আমার হয়েছে যত জ্বালা। বছরে একবারটা যে বাপের বাড়ি আসব তার ঝামেলা কত।'

সরস্বতী বলল, 'মা তোমার প্যানপ্যানানি বাড়ির জন্য তোলা থাক। রাস্তায় সীন্ ক্রিয়েট কোরো না।'

মা ফিরে চলেছেন কৈলাসে। আবার আসবেন তিনি আসছে বছরে তাঁর সন্তানদের কাছে।

যে-দেবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল ভূতে ভৌতিক শক্তিরূপে সংস্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার।

মনের ব্যাধি

রাজাধিরাজ শ্রীশ্রীহবুচন্দ্র গোলমাল একেবারে পছন্দ করেন না। কোলাহল তাঁর সয় না; স্নায়ুতে বড় চাপ পড়ে। আর এ স্নায়ুও তো আজকের নয়। বয়স কি কম হল শ্রীশ্রীহবুচন্দ্রের! কবে এক মান্ধাতা-যুগে তাঁর আবির্ভাব এই ধরাধামে, তার পর থেকে তিনি সেই যে রাজদণ্ড শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরলেন, আর ছাড়লেন না সে ন্যায়-কঠিন দণ্ড! কত পুরুষ এল, কত পুরুষ গেল, তিনি টিঁকে আছেন ঐ দণ্ড-চালনার জন্য। এ বড় কঠিন দণ্ড—ন্যায়ের দণ্ড। বংশদণ্ড লৌহদণ্ডের চেয়ে শতগুণে কঠিন। তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন। ন্যায়ের দণ্ডকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করবার জন্য থাকতে হবে তাঁকে, আত্মত্যাগ করতে হবে। 'বাহাত্তুরে', 'ভীমরতি' প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের বয়োবিপাক অতিক্রম করে বহু স্তুতিনিন্দা অক্লেশে পরিপাক করে প্রজানুরঞ্জক রাজাধিরাজ শ্রীশ্রীহবুচন্দ্র আজও দশের কল্যাণে আত্মদান করে চলেছেন।

কিন্তু নির্বোধ সেই দেশে কে বোঝে এই স্বার্থত্যাগের মহিমা! অবুঝ অপরিণত বালখিল্যের দল মাঝে মাঝে বড় কোলাহল করে। ওরা জানে না যে গোলমালে রাজাধিরাজের স্নায়ুতে চাপ পড়ে। যে-স্নায়ু এই দীর্ঘকাল দেশের প্রতিটি মর্মব্যথাকে বহন করে জীর্ণ হয়েছে সেই স্নায়ু সম্পর্কেও ওদের একটু মমতা নেই। হায় অদৃষ্ট!

এমনি একটা কোলাহল একদিন রাজাধিরাজের প্রভাতী নিদ্রার আমেজ-টুকু নষ্ট করে দিল। শয়ন চা পর্যন্ত খাওয়া হয়নি তখনও। বিরক্ত স্বরে শ্রীশ্রীহবুচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, 'গবু, ব্যাপার কি?'

মন্ত্রীবর গবু বলল, 'রাজ্যের সব লোক এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

পবননন্দন-সুলভ দন্ত খিঁচিয়ে হবু বললেন, 'দেখা? অমনি বললেই

হল! রাজাধিরাজ চারশ-কুড়ি শ্রীযুক্ত হবুচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেই দেখা করা যায়?'

'আজ্ঞে, আমিও তো তাই বললুম।'

'হুঁ, কি বললে?'

'বললুম, রাজাধিরাজ যার-তার সঙ্গে দেখা করেন না। তাঁর একটা ইজ্জৎ নেই? তাঁকে তোমরা বে-ইজ্জৎ করতে চাও?'

'ঠিক বলেছ। আমার সঙ্গে দেখা করতে হলে রেশমের জামা পরে আসতে হবে বলে দিয়েছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর পায়ে চাই মখমলের নাগরা।'

'হ্যাঁ, তাও বলেছি। কিন্তু মুশকিল হ'ল গিয়ে মখমল-রেশম তো দূরের কথা, ওদের গায়ে-পায়ে কোন পদার্থই নেই।'

রাজার গায়ে কে যেন পঞ্চদশীর লজ্জা লেপটে দিল। আঁতকে শিউরে উঠে রাজা বললেন, 'ছি, ছি, কি অসভ্য! খালি-পা আদুল-গা! ছি!'

'শুধু আদুল-গা! কোমরে পর্যন্ত বিশেষ কিছু নেই।'

'চুপ, চুপ। ছি, কি অশ্লীল! এই পোষাকে ওরা রাজবাড়ীতে এসেছে? এই রকম অশ্লীল সাজে ওরা রাস্তায় বেরোয় কি করে, একটু লজ্জাও করে না!'

'নির্লজ্জ! বেহায়া!' ধিক্কার দিল মন্ত্রীবর গবুচন্দ্র।

'বলে দাও—দেখা হবে না। ওদের অশ্লীল অস্তিত্ব দিয়ে আমার প্রাসাদের সম্ভ্রম-হানি যেন ওরা আর না করে—এই মুহূর্তে ওদের চ'লে যেতে বলো।'

'আজ্ঞে বলেছি।'

'বলে দাও, আমি এক-কথার মানুষ। রেশমের জামা আর মখমলের জুতো না প'রে এলে আমার সঙ্গে দেখা হবে না।'

'বলেছি। তবু নড়তে চায় না। আপনার ন্যায়-দণ্ডটা একটু মৃদুভাবে প্রয়োগ করবেন?'

'আচ্ছা অসভ্য তো।'

'আজ্ঞে, কে?'

'ঐ লোকগুলো।'

'হ্যাঁ, আমিও তো তাই বলি।'

'কথা বললে কথা শোনে না। একটু ভদ্রতা-শিষ্টতা পর্যন্ত জ্ঞান নেই!' ওদের শিষ্টাচার-শিক্ষা যে কত অসম্পূর্ণ তা ভেবে রাজাধিরাজ মর্মাহত হয়ে গুম্ মেরে গেলেন।

'আপনার স্নায়ুব দুর্বলতাব কথাটাও ওদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছি।' নিবেদন করল গবুচন্দ্র।

'হুঁঃ! ওরা যদি অতটাই বুঝতো তবে আর—যাক্‌গে, কি চায় ওরা?'

'ওরা নাকি ক্ষুধার্ত।'

'ক্ষুধা!' চিন্তিতভাবে বললেন রাজা, 'হ্যাঁ, কথাটা শুনেছি যেন এর আগেও। কথাটার মানে বোধ হয় অভিধানে লেখে—হ্যাঁ, কি লেখে, মন্ত্রী?'

গবুচন্দ্র একটা অভিধান তাড়াতাড়ি হাতড়ে গড়্‌গড় করে পড়ে গেল, 'কোন বস্তুকে মুখ-গহ্বরের পথে উদর-গহ্বরে প্রবেশ করানোর ইচ্ছেকে সাধু বাংলায় বলা হয় ক্ষুধা। এর সিম্পটম হচ্ছে—পেট চুঁইচুঁই করা।'

'আচ্ছা, ওদের যেতে বলে দাও। আমি ওদের ক্ষুধা সম্পর্কে চিন্তা ক'রে পরে ওদের আমার মতামত জানাব। আমি একটু ভেবে নি।'

ক্ষুধার্ত লোকগুলো আশ্বাস পেয়ে ফিরে গেল। রাজাধিরাজ যখন স্বয়ং ভেবে দেখছেন, তখন আশার কারণ আছে বৈকি!

হবুরাজ বললেন, 'গবু, আমি আমার গবেষণাগারে ঢুকছি চিন্তার জন্যে। তুমি আমার খাবারগুলো ঠিক সময়মত পাঠিয়ে দিয়ো। খাবার দিতেই শুধু একজন লোক ওখানে ঢুকবে। নইলে আর যেন কেউ আমায় বিরক্ত না করে।'

হবুচন্দ্রের গবেষণাগারটা লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরীর একটা দ্বন্দ্ব সমাস। বই থেকে বুনসেন বার্নার পর্যন্ত যাবতীয় বস্তু অতি সুন্দরভাবে সাজান আছে। শুধু সাজানোর ডিজাইন করাতেই শিল্পীকে দিতে হয়েছিল

এক লক্ষ আশি হাজার রৌপ্যমুদ্রা। শুধু এই থেকেই বোঝা যায় গবেষণাগারটা কত উঁচু জাতের।

গবেষণাগারটির কেন্দ্রস্থলে একটি গদী-বাহন ফরাশ পাতা। তার ওপরে গুটি চারেক সুকোমল তাকিয়া। গবেষণার শ্রম লাঘব করবার জন্য এই ব্যবস্থা। এখানে গা এলিয়ে দিলে কর্মের নতুন প্রেরণা পাওয়া যায়। বিশ্রাম কাজেরই অঙ্গ—এ সত্যটা জানেন রাজাধিরাজ।

জানেন বলেই হবুচন্দ্র প্রথমে বিশ্রাম-টুকু সেরে নেওয়া মনস্থ করলেন। কাজের ঐ অঙ্গটুকু সেরে রাখাই ভাল। হবুচন্দ্র কাজ ফেলে রাখা পছন্দ করেন না। সক্রিয়তার অভ্যাস তাঁর।

গবু-প্রেরিত খাবার ঠিক সময় মত আসতে লাগল এবং হবু চর্বণ-চোষণ-লেহন-পানের পরে শুয়ে বসে কাৎ হয়ে চিৎ হ'য়ে ঘুমিয়ে জেগে চিন্তা করতে লাগলেন। চিন্তার বিষয়—ক্ষুধা কি?

ক্ষুধা শব্দের উৎপত্তি ব্যুৎপত্তিগতভাবে কোথা থেকে হ'ল এটা বোঝার জন্য শব্দকল্পদ্রুমখানা অল্পসল্প উল্‌টিয়ে-পাল্‌টিয়ে নিঃশব্দে মাথার তলায় বালিশের মত চালান করে দিয়ে সশব্দ নিদ্রার মধ্যেও সংস্পর্শ-পথে মস্তিষ্কের ভাঁড়ারে জ্ঞান সংগ্রহ করতে লাগলেন।

রাজ্যের লোক প্রতীক্ষা করতে লাগল। দুর্বল-হৃদয় বহু ব্যক্তি প্রতীক্ষার গুরুভার বুকের ওপর সহ্য করতে না পেরে হৃৎক্রিয়া বন্ধ ক'রে দিয়ে হবুচন্দ্রের রাজ্য-ছেড়ে পর রাজ্যে পাড়ি দিল। শোনা যায় সে রাজ্যে নাকি ক্ষুধা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।

অবশিষ্টের সামনে রাজাধিরাজ এক শুভ দিনে দর্শন দিলেন।

রাজাধিরাজ হবুচন্দ্র বললেন, 'বৎসগণ, তোমরা মিথ্যে উতলা হচ্ছ। ক্ষুধা বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। ওটা একটা ভ্রান্তি, মায়া। আমি ব্যাধির বিশ্বকোষ তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, কোথাও ক্ষুধা নামে কোন রোগের নাম দেখতে পাইনি। তোমরা অনর্থক ভাবছ যে, ক্ষুধার প্রকোপে তোমাদের মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু এর চেয়ে ভুল ধারণা আর কিছু নেই। আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা এ সত্য জানতেন।

ক্ষুধাবোধ ছিল না তাঁদের, তাই বনে-বাদাড়ে চালাঘর তুলে হরিনাম গান করে জীবন কাটিয়ে দিতেন। তাই তাঁরা বিশ্বজনকে ডেকে বলেছিলেন, তোমরা অমৃতের পুত্র, অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু নেই। ঋষিদের এই বাণী স্মরণে রেখেও, দেশবাসীগণ, আমি তোমাদের অবিশ্বাস করি না। তোমরা নিছক মিথ্যে কথা বলতে আমার কাছে নিশ্চয়ই আসনি। তাই আমি ক্ষুধা সম্পর্কে এক সুকঠোর গবেষণা চালিয়ে যাই এবং জগতের বৃহত্তম আবিষ্কার আমার হাতেই সম্ভব হ'ল।'

'কি আবিষ্কার? কোন্ খাদ্য? একদিন খেলে কতদিন থাকা যায়? দাম কত? তরল না কঠিন, না বায়বায়? গিলে খেতে হবে, না ইনজেকশন নিতে হবে? নাকি শুঁকলেই চলবে?' মূর্খ জনসাধারণের কাছ থেকে এই ধরণের অর্বাচীন প্রশ্ন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসতে লাগল।

'তোমাদের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অর্থহীন। আমি ক্ষুধার স্বরূপ আবিষ্কার করেছি।' বললেন হবুচন্দ্র।

'স্বরূপ বলে তো কোন খাবারের নাম শুনিনি। সরাব নয় তো?' জনসাধারণের মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেল।

'শোন, প্রিয় বৎসগণ, ক্ষুধা এক রকমের মনের ব্যাধি। মুখগহ্বরের পথে উদরগহ্বর পূরণের ইচ্ছাকে বলে ক্ষুধা। ইচ্ছা ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবেই মনের। অতএব ক্ষুধাও পুরোপুরি মানসিক। মনের এই ব্যামো হলে উদরগহ্বরে চুঁই চুঁই শব্দের একটা ক্ষীণ যন্ত্রণার ভ্রান্ত অনুভূতি জন্মায়। কিন্তু ও ধরণের কোন যন্ত্রণাকাতর শব্দ যে আদবে ঘটেই না তা যে কেউ ক্ষুধা-ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের পেটে কান পেতে পরখ করে নিতে পারে। এই মনোবিকারের সঙ্গে আসলে দেহের কোন সম্পর্ক নেই। এ ব্যাধিকে দৈহিক ভাবাও অবশ্য এই রোগের রোগীদের একটা সাধারণ সিম্পটম। এই মনোবিকারে শেষে মৃত্যুভয় পর্যন্ত মনে জাগতে পারে। তখন রোগীরা বিকারবশে উচ্ছৃংখল হয়ে চুরি-ডাকাতি থেকে খুন-খারাপি পর্যন্ত করে বসতে পারে। অর্থাৎ বিকার উন্মত্ততায় পরিণত হয়।'

উপস্থিত লোকেরা মুখগহ্বর ব্যাপক ব্যাদিত করে রাজাধিরাজের বৃহত্তম আবিষ্কারের সারগর্ভ ভাষণ শোনে।

রাজাধিরাজ অবশ্য থামেননি। উৎসাহের সঙ্গে তিনি গবেষণার দ্বিতীয় অংশ বিবৃত করেনঃ 'আমি অবশ্য এই ব্যাধির প্রতিকারের কথাও ভেবেছি। মনকে সাধনার দ্বারা ইচ্ছামুক্ত রাখাই একমাত্র ওষুধ। এর জন্যে নিয়মিত মানসিক ব্যায়াম প্রয়োজন। ব্যায়ামে মানসিক জোর বাড়িয়ে শুধু মনে করতে হবে যে, আমার কোন ইচ্ছে নেই, সব ইচ্ছের মৃত্যু ঘটেছে আমার মধ্যে, উদরে কিছু প্রবেশ করাতে চাই না। ব্যস, তাহলেই হবে। শুধু মনটাকে একটু অবিচলিত রাখা। ইচ্ছে হচ্ছে বাঁদরের মত—আদর দিলেই মাথায় চেপে বসে। সেই জন্যে ইচ্ছেটাকে শাসনে সংযত করে পোষ মানাতে হবে। আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক সাধনারও এইটাই মূলকথা—ইচ্ছের একেবারে গোড়া ঘেঁসে কাটো। সুতরাং বৎসগণ, তোমরা মানসিক ব্যায়াম ক'রে মনের তাকৎ বাড়াও।'

এত উচ্চচিন্তাযুক্ত ভাষণ, যার মধ্যে যুগের বৃহত্তম আবিষ্কার স্পন্দিত, তা বহু বুদ্ধিহীন মানুষের মস্তিষ্কে কোন সাড়া জাগাতে পারল না। দুর্ভাগ্য রাজাধিরাজের! ঐ লোকগুলোর মস্তিষ্ক বড় উত্তপ্ত—তারা অকারণ অশোভন চীৎকার জুড়ে দিল।

রাজাধিরাজ বললেন, 'হুঁ, এই কয়েকটির তো মনোবিকার উৎকট উন্মত্ততায় পরিণত হয়েছে। এদের উন্মাদ আশ্রমে পাঠাও, গবু।'

'এত উন্মাদ-আশ্রম কোথায় পাবো রাজাধিরাজ?' বলল গবুচন্দ্র।

'না পাওয়া গেলে কারাগারগুলোকে কাজে লাগাও। ওখানে ওদের রাখো, সঙ্গে চিকিৎসারও সুব্যবস্থা কর!'

কয়েকদিন বাদে মন্ত্রীবর গবুচন্দ্র জানালঃ 'স্থান সংকুলান হচ্ছে না মহারাজ। আমাদের রাজ্যে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা এত বেশী—!'

'কেন? কি হয়েছে?'

'অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা অগণ্য। তারা ক্ষুধাকে মনের ব্যাধি বলে জানে না। ওদের মনের দীর্ঘ সংস্কার রয়েছে যে ওটা সম্পূর্ণ দৈহিক।'

'এই কুসংস্কার ওদের মন থেকে দূর করতে হবে। দেশের মানুষকে সংস্কৃত শিক্ষিত করে তুলতে হবে।'

'তাহলে আরো গোটাকত উন্মাদ কারাগার দরকার।'

'দরকার বুঝলে কর। দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ তো করতেই হবে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্ব অর্থত্যাগের কথাই তো বলছি।'

'নিয়ে যাও রাজকোষ থেকে। দেশ ভর্তি উন্মাদ-আশ্রম বানাও। সকলের মানসিক ব্যাধি দূর করে নতুন সুস্থ মনুষ্যত্ব দাও সবাইকে। এই তো আমাদের ব্রত।'

ব্রত-পূরণের জন্য একের পর এক উন্মাদ-আশ্রম বানানো চলতে লাগল। উন্মাদ-আশ্রমের প্রকোপে মানুষের বাসগৃহ প্রায় লোপাট। কিন্তু তবু স্থান-সংকুলান হয় না। সব লোক যেন ক্ষেপে উঠেছে; রাজাধিরাজের সঙ্গে আড়াআড়ি করে তারা বারবার আর্তনাদের স্বরে জানায় যে ক্ষুধা দৈহিক। এ যে লোকগুলোর নেহাৎই অজ্ঞতা অথবা অবাধ্যতা তা রাজা হবুচন্দ্র ভাল করেই বোঝেন। সুতরাং কাতারে কাতারে লোক ঠাঁই নিচ্ছে উন্মাদ-আশ্রমে। আশ্রমগুলো আকণ্ঠ পূর্ণ, তবু লোক পড়ে রইল উদ্‌বৃত্ত।

রাজা পড়লেন মহা সমস্যায়। দেশ ভর্তি এত উন্মাদ-আশ্রম তৈরী করা হল, তবু কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না! এত মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের ঠাঁই দেওয়া যায় কোথায়? ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। দুশ্চিন্তায় রাজাধিরাজ নিজের চুল ছিঁড়তে লাগলেন।

রাজার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে লাগল। যে-স্নায়ু দীর্ঘকাল ধরে জাতির মর্মব্যথাকে বহন করে জীর্ণ হয়েছে তাতে পড়ল আরো জোরাল টান। রাজ্যে প্রচণ্ড সংকট। বাঘা বাঘা বৈদ্যরা লক্ষ অনুপান সহ সহস্র ওষুধ বাতলালো। কিন্তু রাজার দুশ্চিন্তা ঘোচে না। কাতারে কাতারে মানুষ আসছে তাদের ক্ষুধার দাবী নিয়ে, অর্থাৎ উন্মাদ-আশ্রমের দাবী নিয়ে। কিন্তু যায়গা কোথায়? প্রজার ভাবনা ভেবে ভেবে রাজা একেবারে হিম্‌সিম খেয়ে গেলেন।

মন্ত্রীবর গবুচন্দ্র থেকে কত উপমন্ত্রী, কত অপমন্ত্রী কত পরিকল্পনার কথা বলল কিন্তু কিছুতেই মনোবিকারগ্রস্তদের স্থান সংকুলানের সমস্যা দূর করা গেল না। রাজ্য রসাতলে যায় এমন অবস্থা।

এই রকম সময় এক শুভ প্রত্যুষে রাজাধিরাজের কাছে খবর এল যে একজন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। রাজার ঘুম তখনও ভাল করে ভাঙ্গে নি। পাশ ফিরে শুয়ে পাশ-বালিশটা টেনে নিয়ে রাজা বললেন, 'দেখা হবে না বলে দাও।'

গবু বলল, 'মহারাজ, লোকটি আপনার পরিচিত এবং বিশেষ বুদ্ধিমান।'

'কে সে?'

'আজ্ঞে, সেই মুচি-টি।'

'কোন্ মুচি?'

'যে আপনার শ্রীচরণকমল মালিন্যমুক্ত রাখবার জন্য জুতো আবিষ্কার করে আপনাকে উপহার দিয়েছিল, সেই লোকটি। আপনার হয়তো মনে আছে, লোকটির বুদ্ধি বিশেষ প্রখর।'

'হ্যাঁ, বেশ মনে আছে। পায়ে ময়লা যাতে না লাগে তার জন্যে কি আপ্রাণ চেষ্টাই না করেছিলুম! হাজার হাজার ঝাঁটায় ধূলো উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলুম। লাখ লাখ ঘড়া জল ঢালিয়েছিলুম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। পৃথিবীর ময়লা আর কিছুতেই যায় না। বাইরে পা দেওয়া মাত্র পায়ে ধূলো-কাদা লাগে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তখন এই মুচি এসে আপনাকে জুতো নামে তখন-অজ্ঞাত এক মহাবস্তুর সন্ধান দিয়েছিল, যার ফলে অতি সহজে আপনার শ্রীচরণ-কমলের শুভ্র মাধুর্য অক্ষুণ্ণ রাখা গেছে।'

'হ্যাঁ, তা কি চায় লোকটা?' এ পাশ ফিরলেন রাজাধিরাজ।

'মুচি-টা বলছে, ও অনুরূপ একটা কৌশল রাজাকে বলতে চায় যাতে করে মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের স্থান সংকুলানের সমস্যা চিরতরে দূর করা যাবে।'

'তাই নাকি? ভাল করে চোখ খুললেন রাজা। 'তুমি তাহলে শুনে রাখো। আমি একটু ভোরের ঘুমটা দিয়ে নিই।' আবার চোখ বুজলেন হবুচন্দ্র।

'আজ্ঞে সে-কথা বলেছিলুম। কিন্তু মুচি অন্য কারুর কাছে কথাটা বলতে চায় না।'

'বটে।' আবার চোখ খুলতে হল রাজাকে। 'বাটা এক জোড়া জুতো বানিয়ে লায়েক বনে গেছে।'

'তবু একবার ভেবে দেখুন, আজ্ঞে, লোকটা বিশেষ বুদ্ধিমান এবং এই সমস্যা—'

'আচ্ছা ডাকো মুচিটাকে।' পাশ-বালিশটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রাজা। গবুচন্দ্র ডেকে নিয়ে এল। প্রবীণ মুচি মন্থর পদক্ষেপে এসে দাঁড়াল। বিনীতভাবে বলল, 'হুজুর আপনার মুশকিলের কথাটা কানে গেল, তাই আর ঘরে বইতে নারনু। আপনি হুজুর মা-বাপ, আপনার বিপদ তো আমাদেরও বিপদ। তাই কথাটা কইতে এনু।'

'বেশ, বল তোমার বুদ্ধিটা।'

'আজ্ঞে, কর্তা, সেই জুতোর ব্যাপারটা মনে করুন। সারা দুনিয়ার ময়লা মারা যায় না বলে আপনার সিচরণ-জোড়া চামড়ায় বেঁধে দিইছিনু। এবারও ঐ বুদ্ধিটাই করুন কর্তা। সারা রাজ্যের লোকই যখন মনের ব্যামোয় ভুগছে, তখন এত বড় পাগলা-গারদ আপনি পাবেন কোথায় হুজুর? তার চেয়ে আপনি আর আপনার দু'চার জন লোক যাদের এখনও মনের ব্যামোয় ধরেনি, তারা যদি ঐ উন্মাদ-আশ্রম না কি বলে ওর মধ্যে গে' থাকেন, তাহলে বাকী লোকেরা বাইরে থাকলেও ক্ষেতি নেই কিছু। আপনিও নিরাপদে রইলেন সিভগমানের ইচ্ছেয়, আর মনের ব্যামোয় ভুগছে সে-সব পাগলাগুলো তেনারাও ইদিকে উদিকে চড়ে-বেড়িয়ে টিকে গেল। দু'দলেরই মঙ্গল। কথাটা ভেবে দেখুন কর্তা। দশের মঙ্গল চিন্তে ক'রে বলুন কর্তা, কথাটা আমার খাঁটি কি না।'

রাজাধিরাজ চারশ'-কুড়ি-শ্রী-যুক্ত হবুচন্দ্রের মুখটা লম্বা হ'তে হ'তে চোয়ালাটা একেবারে ঝুলে গেল। আর মন্ত্রীবর গবুচন্দ্রের দু'টি নয়ন-রসমণ্ডি দেখতে দেখতে ছানাবড়ায় রূপান্তরিত হয়ে গেল।

'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর'—এই কথাটা ছোটবেলা থেকেই মানেন প্রিয়লাল। তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে তিনি কেবল বিশ্বাসই করে আসছেন। বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই করেননি জীবনে। হাঁচি-টিক্‌টিকি, মঘা-অশ্লেষা, তাবিজ-মাদুলি, জলপড়া-মন্ত্রপড়া-ঝাড়-ফুঁক, পুরুৎ-গণৎকার ইত্যাদি কাউকে বাদ দেন নি প্রিয়লাল। সবাইকে ষোলো-আনা বিশ্বাস করেছেন, আঠারো আনা মাশুল দিয়ে তৃপ্তি বোধ করেছেন। তাছাড়া সর্বাধুনিক আদমসুমারী অনুযায়ী তেত্রিশ কোটি তেরো লক্ষ দেবতা এবং অজ্ঞাত-সংখ্যক অপদেবতা (সঠিক সংখ্যা অজ্ঞাত, কারণ এদের আদমসুমারী হয় নি) তো আছেনই। অর্থাৎ এক আত্মবিশ্বাস ছাড়া সকল প্রকার বিশ্বাসই তাঁর আছে। সেই ছোটবেলা থেকে এই বিশ্বাস জমতে জমতে আজ একটা অতিকায় পিরামিডের আকার ধারণ করেছে। চোখ বুজে যখন যেদিকে তাকান প্রিয়লাল, গর্বে আনন্দে তাঁর বুক ভরে ওঠে।

পঁয়তাল্লিশ বছরের সঞ্চিত এই পিরামিডের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে তিনি যখন রাজকীয়ভাবে আসীন, তখন এক ভারত-ইংলণ্ড-খ্যাত রাজজ্যোতিষী প্রিয়লালকে বলল, 'আগামী শুক্লা সপ্তমীতে আপনার মৃত্যুযোগ রয়েছে।'

প্রিয়লাল আঁৎকে উঠলেন। মৃত্যুযোগ কথাটার আসল মানে যে বিয়োগ জগৎ-সংসার থেকে! এই যোগের বিয়োগ-আশঙ্কায় অধীর হয়ে ডুবতে ডুবতেও খড় ধরবার চেষ্টায় তিনি বললেন, 'কোন উপায় নেই? কোন শান্তি স্বস্ত্যয়ন? যত টাকা লাগে—।'

যাঁর খ্যাতির এক পা ভারতে, আর এক পা ইংলণ্ডে, তিনি আরো কিছু আঁকজোঁক কেটে মাথা নাড়লেন: 'না।' তারপর তিনি একটা বক্তৃতা দিলেন যার একটি বিন্দুও প্রিয়লালের মাথায় ঢুকল না। শুধু শনি, বৃশ্চিক, চন্দ্র, কর্কট ইত্যাদি কতগুলি শব্দ মগজের মধ্যে ধাক্কা মারতে লাগল। এঁরা নাকি কুপিত হয়েছেন; প্রিয়লাল এঁদের কারুর

বাড়া ভাতে ছাই দেন নি, মই দেন নি পাকা ধানে, তবু—। সকলে একযোগে ঐ শুক্লা সপ্তমীতে প্রিয়লালের মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়বেন।

প্রিয়লাল তার কেশরহিত তৈলচিক্কণ মস্তকে হাত বোলাল একবার। হায়, দুনিয়ায় কত শত সুকেশ শোভন মাথা থাকতে এটার ওপরই যত আক্রোশ!

বাড়ীতে গৃহিনীকে বললেন প্রিয়লাল। গৃহিনী তখুনি মড়াকান্না সুরু করলেন, 'ওগো, তুমি যে ইলিশ মাছের ঝোল খেতে ভালবাসতে গো—হো-হো-হো-ও-ও-ও।'

পরদিন প্রিয়লাল বাজার থেকে অতিকায় একটা ইলিশ কিনে নিয়ে এলেন। প্রিয়লাল মনের দুঃখে এক চিল্‌তের বেশি খেতে পারলেন না। আর গৃহিনী ল্যাজা থেকে মুড়ো গোটাটাই গলাধঃকরণ ক'রে চিবিয়ে কাঁটাগুলোকে পর্যন্ত ধূলো করে ফেললেন। উপায় কি—পয়সার কেনা জিনিষটা তো আর ফেলা যায় না।

কাপুরুষ নন প্রিয়লাল, কিন্তু ইংলণ্ড-ভারত-খ্যাত জ্যোতিষীর এ হেন বেদবাক্যি শুনলে কে মৃত্যুর আগে না মরে পারে! তিনি মৃত্যুর আগে মরে পড়ে রইলেন।

ছেলেরা এসে বলল, 'বাবা, তুমি যখন মরবেই, তখন আমাদের মেরে যাচ্ছ কেন?'

'অ্যাঁ।' মৃত্যুর সমুদ্র থেকে মুখটা উঁচিয়ে প্রিয়লাল শুধু ঐ একটি শব্দ করলেন। তারপরেই তাঁর মনে হল তিনি যেন কত শত-যোজন দূরের এক গ্রহ থেকে ছেলেদের দেখছেন। ছেলেদের চেহারাগুলো তাঁর চোখে ঝাপসা লাগছিল। আর তিনি নিশ্চিত বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর নিজের চেহারাটাও ছেলেদের কাছে কয়েক পিণ্ড ধোঁয়া ছাড়া কিছুই মনে হচ্ছে না। এমন কি নিজেও তিনি নিজেকে ধূম্রদেহ দেখছেন। যতটুকু অ-ধূম লাগছে তা প্রিয়লালের চোখের ভুল। ছেলেদের কথাগুলোও যেন কতগুলো অর্থহীন ধ্বনি—এলোপাথাড়ি

তালগোল পাকিয়ে ছিট্‌কে পড়ছে ছেলেদের মুখ থেকে, তাঁর কানে আঘাত করছে।

ছেলেরাই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল, তুমি মরলে ডেথ-ডিউটিতে তোমার সব টাকা তো শালার গভরমেণ্ট ফুঁকে দেবে। উকীল ডাকি, একটা ব্যবস্থা কর।'

'কি ব্যবস্থা ?'

'আমাদের দান করে দাও। গিফ্‌টের ট্যাক্‌সো কম। লেখাপড়া হয়ে যাক। নইলে তুমি না-বলে-কয়ে হঠাৎ টেঁসে গেলে, আমরা ফেঁসে যাব যে—।'

উকীল ডেকে লেখাপড়া করিয়ে নিল ছেলেরা। হা কপাল! আজকাল গিফ্‌টের ওপরেও ট্যাক্‌সো! উপহার দেবার মৌলিক অধিকারও কেড়ে নিতে চায় নরাধমরা!

স্ত্রী কেঁদে এসে বললেন, 'তুমি আমার কি করলে ? আমায় কি ছেলে-বৌদের বাঁদী করে দিতে চাও ?'

প্রিয়লাল স্ত্রীর নামে কিছু রাখলেন। স্ত্রী-পুত্রের আসন্ন-শোক মনে হাসি ফুটে উঠল।

প্রিয়লাল বাইরের সবার সঙ্গে দেখা বন্ধ করে দিলেন। কি হবে দেখা করে! যাদের সঙ্গে দেখা করবেন, তারা তো এ জগতের লোক। তিনি তো পরলোকের মানুষ। এখানে বিদেশী এখন। প্লানচেট যোগে নেমে আসা মানুষ বই তো নন। জীবন উভয়ের আলাদা, ভাষাও আলাদা। ওরা স্থূলদেহী, প্রিয়লালকে এখন সূক্ষ্মদেহীই বলা চলে। ওদের ভাষায় চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার খুবই কম। আর প্রিয়লাল নেহাৎ ওরা ভয় পাবে বলেই যেন আনুনাসিক ধ্বনি বর্জন করেন কথার মধ্যে।

হঠাৎ সব কাজকর্ম ফুরিয়ে গেল প্রিয়লালের। একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে-বসে কাটান। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে ইহ-লোকটাকে দেখেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবেন—আমি একদিন ঐ জগতে ছিলাম। আর লোকগুলো ছ্যাখো কি নচ্ছার! প্রিয়লাল নামে যে একটা লোক মরে গেছে, তার কথা ভাবছেও না একবার। হাসছে,

খেলছে, হা-হা করে কথা বলছে। আর বলবেই বা না কেন, নিজের ছেলেরাই—যাক্‌গে।

প্রিয়লাল ভাবলেন, এত সহজে এত নির্বিকারভাবে ঐ লোকগুলোকে তিনি রেহাই দেবেন না। বাঁচাটা যদিও তিনি মহাপুরুষের মত বাঁচেননি, মরবেন তিনি একজন মহাপুরুষের মত।

নিজেকে অবহেলিত দেখতে কেউ চায় না। শুক্লা সপ্তমীর দিন শনিবার। সেই দিন রাত সারে চারটেয় প্রিয়লাল ইহলোক ত্যাগ করবেন। রবিবার সকালের কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় হেডলাইনে তাঁর মৃত্যুসংবাদ যাতে ছাপা হয় তার ব্যবস্থা করলেন—অবশ্যই টাকা দিয়ে। টাকা ভালই ছিল জমিদার প্রিয়লালের।

জীবনী লেখালেন রবীন্দ্র-পুরস্কার ছুঁই-ছুঁই করছে এমন সাহিত্যিক দিয়ে। ছাপিয়ে কাগজের অফিসে এক এক কপি পাঠালেন সাব-এডিটরদের সাহায্য করবার জন্যে। বাকী রেখে দিলেন শবযাত্রার খই-পয়সার সঙ্গে ও শ্রাদ্ধবাসরে ভোজ্যের সঙ্গে বিলোবার জন্যে। বেলুড়ের কাছে খানিকটা জমি কিনে স্মৃতিসৌধ বানাতে সুরু করলেন।

গৃহিনী ও পুত্রেরা এই সব অপব্যয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু লোকের যখন মরণ-বাড় বাড়ে, তখন কি সে কারো কথা শোনে!

এই অপব্যয়ে অন্য কিছু হোক বা না হোক প্রিয়লাল একটা চাকরি পেলেন। কীর্তির ইমারৎ বানাতে তিনি অন্তত কিছুটা মৃত্যুভয় থেকে রেহাই পেলেন। রাতে শুধু তাঁর মানসচক্ষে ভূতপ্রেত নাচে, সে-দুঃস্বপ্ন এড়াবার উপায় নেই।

এক-পা এক-পা করে এক একটা দিনের জমি পার হয়ে এগিয়ে আসতে থাকে সেই অশুভ শুক্লা সপ্তমী—সেই রাহুগ্রস্ত অর্ধচন্দ্র—সেই শনি-চিহ্নিত বার।

পরলোকে একটা ভাল বাড়ী যাতে পাওয়া যায়, তার জন্য যজ্ঞ হোলো শুক্রবার। শনিবারের দিনও কেটে গেল। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল রাতে। প্রিয়লাল বিছানা কামড়ে পড়ে রইলেন। মিনিটকে ঘণ্টা মনে হচ্ছে।

প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, এই বুঝি মৃত্যু হোলো। মৃত্যু যে কোন্ মূর্তিতে আসবে তা বুঝতে না পারার জন্য আরো অস্বস্তি। পেট-কঁক-কঁক, বুক-টিপটিপ, মাথা-ভন্‌ভন, চোখ-কট্‌কট্, নাক-সুড়্‌সুড়্, পা-টন্‌টন, জিভ-খস্‌খস্, ইত্যাদি যে সব চেহারায় মৃত্যু সাধারণত এসে থাকে, তার কোনটাই প্রিয়লালের অনুভূতিতে আসছে না—বোধ হয় অনুভূতি অসাড় হয়ে গিয়েছে বলেই। অথচ তিনি অসুস্থ—ঘোরতর অসুস্থ—কিছুক্ষণের মধ্যেই এ জগৎ ছাড়বেন। কিন্তু সারা দেহ হাতড়ে কোথাও অসুস্থতাকে খুঁজে পাচ্ছেন না—এতে ভয় পেলেন প্রিয়লাল আরো বেশী। যেন চোরটা বাড়ীর মধ্যেই আছে জানি, অথচ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এতে ভয় বেশী পাওয়াই স্বাভাবিক। অদৃশ্য নিরুদ্দেশ অসুস্থতা সবচেয়ে মারাত্মক। সেই অসুখেই ভয় বেশি, যার ডায়গোনেসিস্ হয়নি।

হঠাৎ ক্রিং-ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠল। আঁতকে উঠলেন প্রিয়লাল। ঐ বোধ হয় মৃত্যু এসেছে। ধপাস্ করে পড়ে গেলেন বিছানার ওপর। আত্মসমর্পণ করলেন প্রিয়লাল মৃত্যুর কাছে। কিন্তু যমদূত তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে না শুধু ক্র্যাং-ক্র্যাং ঘ্যাং-ঘ্যাং শব্দে চিৎকার করছে। অনেকক্ষণ বাদে প্রিয়লালের বোধগম্য হোলো, ওটা টেলিফোন।

'হ্যালো, কে ?'

একটা খবর-কাগজের অফিস থেকে বলছে, 'ছবি ও জীবনী সহ আপনার মৃত্যুসংবাদ খুব ভালভাবে ছাপা হয়েছে। দূরের ডাকের 'এডিশন্' সব ছাপা হ'য়ে চলে গিয়েছে। আর 'সিটি এডিশন্' ছাপা প্রায় শেষ হ'য়ে এল। আপনার সংগৃহীত বিখ্যাত লোকের শোকবাণী যথাযথ ছাপা হয়েছে।'

একটু বাদে পরপর আরো কয়েকটি টেলিফোন এল। সবগুলিই খবর কাগজ থেকে। এবং বার্তা প্রায় একই।

এতদিন প্রিয়লালের মৃত্যু-সংবাদ জানতেন তিনি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ এক-আধজন, আজ বিশ্বের কাছে চলেছে সে-সংবাদ। পৃথিবীতে আজ তিনি সত্যি-সত্যি মৃত! তার নামের আগে এবার থেকে বসবে না "শ্রী",

থাকবে বি-শ্রী ৺। ৺প্রিয়লাল সেন। কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে! অপরিচিত, এবং আতঙ্ককর।

আর সময় নেই বেশি। সাড়ে চার প্রায় বাজে। এবার পৃথিবীকে শেষ সেলাম জানাবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। মুখ বিকৃত করে মরলে ক্ষতি নেই, কারণ "মৃত অবস্থায় শায়িত" ফটো তিনি আগেই ভাল পোজে তুলিয়ে খবর কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ঘড়ির কাঁটা একটা বিষাগ্র তীরের মত দ্রুত গতিতে তাঁর মৃত্যু-মুহূর্তের দিকে ছুটে চলেছে। প্রিয়লাল আড়াই সের ঘেমে ফেললেন।

কিন্তু এ কি! নিশ্চয়ই তিনি ভুল দেখছেন। অথবা তাঁর মাথার ঠিক নেই, কিংবা ঘড়িটা তাঁর আতঙ্ক দেখে একটু মজা করেছে; হাতী কাদায় পড়লে ব্যাং-ও লাথি মারে। ঘড়ির কাঁটা ছুটো ঘোড়ার মত জোর কদমে সেই মৃত্যু-মুহূর্তকে পেরিয়ে গেল।

প্রিয়লাল প্রথমে ভাবলেন, তিনি নিশ্চয়ই মরে গেছেন; মরার ঠিক অব্যবহিত পরের অনুভূতি হয়তো এমনই। ইংলণ্ড ভারত-খ্যাত গণৎ-কারের বলা মুহূর্তটি যখন ঘড়ির কাঁটার হাত ধরে পেরিয়ে গিয়েছে, তখন আর তিনি বেঁচে থাকবেন কি করে! এই রকম মৃত অবস্থায় কিছুক্ষণ কেটে গেল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই তিনি বায়ুদেহ হ'য়ে গিয়েছেন। তবে স্থূল দেহ, যেটা এখনও তাঁর দৃষ্টিগোচর, সেটা কি তাঁর চোখের ভুল! রগড়ালেন চোখ দুটো। তবু দেখতে পাচ্ছেন যে! হায় এ কী দৃষ্টিভ্রম

আবার এদিকে যে তাঁর ছায়াও পড়ছে। কয়েক মুহূর্ত তিনি ভেবে পেলেন না যে কোন্‌টা তিনি—ছায়াটা, না কায়াটা! নিজের গায়ে একটা চিম্‌টি কাটলেন প্রিয়লাল। উঃ, লাগছে। কানটা মোচড়ালেন। এতেও লাগছে। তাহলে কি তিনি মরেননি? একটা উল্লাসের সাঁড়াসাঁড়ি বান সরাসরি মাথা থেকে পা অবধি ছড়িয়ে পড়ল। যেন পুনর্জন্ম হল তাঁর। আবার বেঁচে উঠেছেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল বেটা কাগজওয়ালাদের কথা—সে ব্যাটারা

প্রিয়লালকে মেরে রেখে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি ফোন করলেন কাগজের অফিসে।

'হ্যালো, শুনছেন, আমি মরিনি

'সে কি মশাই! এক মুখে—আপনি ক' কথা বলেন? এই বললেন আপনি মৃত। এই বলছেন, মরেননি।'

'না, মানে, ব্যাপারটা—।'

'আপনি কেমন ধারা ভদ্দরলোক মশাই, কথা দিয়ে কথা রাখেন না!'

'আমার মুস্কিলটা দয়া করে একটু বুঝুন।'

'নিজের মুস্কিলটাই বড় করে দেখছেন আপনি, আমাদের মুস্কিলটা একবার ভেবে দেখেছেন?'

'শুনুন, আমার মরবার কথা ছিল ঠিকই, কিন্তু—।'

'কথা ছিল, তবে মরেননি কেন এখনও?'

'চেস্টার ত্রুটি করিনি আমি, কিন্তু বিশ্বাস করুন—।'

'দেখুন, বাজে কথা বলবেন না। মানুষের সভ্যতা আজ কত উন্নত! এটা অ্যাটম বোমার যুগ। ইচ্ছে করলে নিমেষে কোটি কোটি মানুষ মারা এখন সম্ভব। আর আপনি নিজেকে অর্থাৎ একটি মাত্র লোককে মারতে পারলেন না, আপনি আবার কথা বলছেন! আপনার লজ্জা করা উচিত।'

'সত্যি, আমি লজ্জিত, অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু এখন উপায়?'

'কোন উপায় নেই। আমাদের কাগজ সব বেরিয়ে গেছে।'

'আমার মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে?'

'নিশ্চয়ই। টাকা খেয়েছি আর কাজ করব না, সেটি আমাদের কাছে পাবেন না। এখুনি আপনার বাড়ীতে হকার পৌঁছবে! আপনার মৃতদেহের ছবি শুদ্ধু দেখতে পাবেন।'

'তাহলে এখন?' অসহায় কণ্ঠ প্রিয়লালের।

'এখন মরুন।'

'মরি কি করে?'

'আপনার অসুবিধা হলে আমরা পিস্তলসহ একটা লোক পাঠাতে পারি।

সে আপনাকে সাহায্য করবে।'

'না, না, তার দরকার নেই।'

'বেশ, আপনি নিজেই তাহলে ব্যবস্থা করুন। তবে একটা কথা—বাঁচবার কোন চেষ্টা করবেন না।'

'কেন ?'

'তাতে আমাদের কাগজের সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে।'

এবার একটু চটেই বললেন প্রিয়লাল, 'আপনাদের সুনাম বাঁচাবার জন্য আমায় মরতে হবে ?'

'অগত্যা।'

'যদি না মরি আমি ?'

'বেঁচে থাকলেও আপনিই যে আসল প্রিয়লাল সেটা প্রমাণ করতে হবে।'

'মানে ? আমি কি নকল প্রিয়লাল ?'

'এতগুলো কাগজ যখন ছাপার অক্ষরে বলছে, তখন নকল ছাড়া কি ? আমরা দিনকে রাত, রাতকে দিন করে থাকি। আর একটা জলজ্যান্ত লোককে মড়া বলে চালাতে পারব না ? তা হলে এতদিন সাংবাদিকতার শিখলাম কি ? ছাপার হরফ যে মিথ্যে কথা বলে, প্রায়ই বলে, তা এদেশের লোক জানে না। আপনাকে কোর্টে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, আপনিই আসল প্রিয়লাল, জাল নন। সেটা কি রকম কঠিন—একেবারেই সম্ভব কি না—এটা ভেবে চিন্তে আপনার বাঁচলে ভাল হয় না ?'

প্রিয়লালের হাত থেকে টেলিফোন পড়ে গেল। আসল মৃত্যুর চেয়ে এই কাগুজে মৃত্যু তাঁকে আতঙ্কিত করে তুলছে বেশি। এ যে মৃত্যুর বেড়াজাল! হয় মৃত, নয় জালিয়াৎ।

ছেলেদের ডেকে বললেন, 'আমি তো বোধ হয় এ যাত্রা বেঁচে গেলাম।'

'সে কি! এখন এই মুহূর্তে বাঁচলেও পরে আপনার দৈনন্দিন বেঁচে থাকবার উপায় কি ? আপনার টাকাকড়ি তো সব ফুঁকে দিয়ে বসে আছেন। তখন অত ক'রে বললাম—হুঃ!'

প্রিয়লাল আহত হলেন। তবু বললেন, 'ঠিক, আমার নিজের টাকা আর বিশেষ কিছুই নেই। কিন্তু তোমাদের আমি গিফ্‌ট্‌ বাবদ যা দিয়েছি, তা দিয়ে—।'

'ছি, ছি, সে আপনাকে ফেরৎ দেব কি করে? কোন জিনিস দিয়ে ফেরৎ নিলে কালীঘাটে কি হয় তা তো আপনি জানেন। আমরা ছেলে হয়ে আপনাকে তা হতে দিতে পারি না।'

'নিকালো, কুত্তাকে বাচ্চা।' জুতো ছুঁড়ে দূর করলেন ছেলেদের।

স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'বেঁচে গেলাম।'

গৃহিনী আঁতকে উঠলেন, 'ওমা, সে কি কথা! ছি, ছি, কি লজ্জা!'

'কেন, লজ্জার কি হল?'

'তুমি মরবে না? কথা দিয়ে কথা রাখবে না?'

'হ্যাঁ—তা—না—' তোতলা হয়ে গেলেন প্রিয়লাল।

'তুমি কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারো, কিন্তু আমি ভদ্রলোক। তুমি ভদ্দরলোক না হতে পারো, কিন্তু আমি কথা দিয়ে কথা ফেরাতে পারব না।'

'কি কথা—কাকে দিয়েছ?'

'বাঃ, বীরেনদাকে পাকা কথা দিয়ে দিয়েছি। বিধবা হয়েই রেজেষ্ট্রী করব।'

প্রিয়লাল আর বাঁচতে চাইলেন না। সব রাগ গিয়ে পড়ল ইংলণ্ড-ভারত-খ্যাত গণৎকারের ওপর। হ্যাঁ, তিনি মরবেন। গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণী তিনি সফল ক'রে যাবেন। গণৎকারকেও উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে যাবেন—একটি নরহত্যার শাস্তি।

একটা চিরকুট লিখে প্রিয়লাল আত্মহত্যা করলেন।

পরদিন পুলিশ তদন্তে এসে পেল সেই চিরকুট। ইংলণ্ড-ভারৎ-খ্যাত গণৎকারের নাম-ঠিকানা দিয়ে তাতে লেখা: 'আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী গণৎকার। সে আমাকে খুন করেছে। আমার পাশে বিষের যে প্যাকেটটি পড়ে রয়েছে, তাই থেকে ঐ গণৎকারটি আমায় জোর করে বিষ খাইয়েছে।'

বেশ চমৎকার মঞ্চ। যথেষ্ট খরচা করেই তৈরী। আর খরচা করতে বাধাই বা কি! টাকা তো কম ওঠেনি। সংস্থার সভ্যপদ অর্জন করেছে বেশ কয়েক শ লোক—তাদের মাথা পিছু পাঁচ টাকা করে ধার্য ছিল। অবশ্য সাম্বৎসরিক কোন কার্যাবলীর শরিক তারা নয়, শুধু দিন কতক রাবীন্দ্রিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার ছাড়পত্র-ক্রেতা। সারা বছরে কাজও তেমন কিছু থাকে না বটে! জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে যে টাকাটা উদ্বৃত্ত হয় জলযোগে সেই টাকাটার সদ্ব্যয় করে কর্তৃপক্ষ বর্ষান্তিক অনুষ্ঠানটির সাফল্য-প্রয়াসে দেহমনে বল সঞ্চয় করে। সারা বছর বাপকে ভুলে বার্ষিক শ্রাদ্ধ খুব জাঁকের সঙ্গে করবার রেওয়াজ বরাবরই আমাদের দেশে আছে। এও অনেকটা তেমনি।

কর্তৃপক্ষের মধ্যে নানা পেশার লোক আছে। আবার পেশাহীন লোকও আছে—যাদের পেশা শুধুমাত্র এই সংস্কৃতিচর্চা। সব কাজকর্ম ছেড়ে বসে আছে শুধু সংস্কৃতির হালটি ধরবার জন্য।

এদের চেষ্টায় শুধু সভ্য নয়, অ-সভ্যদের কাছ থেকেও কিছু টাকা তোলা হয়েছে। যে সব লোকের টাকা আছে, কিন্তু কপালে সংস্কৃতির লেবেল আঁটা নেই, তাদের সংস্কৃত নামে খ্যাত হবার তৃষ্ণা আকণ্ঠ। এই তৃষ্ণার্ত পতিত মানবদের উদ্ধারের জন্য পতিতপাবন কর্মীরা এদের পকেট কেটে কিছুটা টাকা বার করে, এবং টাকার পরিমাণ অনুযায়ী আধ কাচ্চা থেকে দেড় সের পর্যন্ত সংস্কৃতি ঐ ছেঁদা পকেটে ঢুকিয়ে দেয়। বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রসারের সব চেয়ে উত্তম পন্থা নগদ আদান-প্রদান।

আর চাঁদা দিয়েছেন একজন মন্ত্রী, একজন এম্-এল-এ। ভবিষ্যৎ নির্বাচনের মুখ চেয়ে তাঁরা হস্ত উপুড় করেছেন। মন্ত্রীর নাম শেঠ ঝুনঝুনওয়ালা, বহু বছর বাংলা দেশে আছেন, ফলে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাজারী

বাংলা বলতে পারেন। বহু বছর বঙ্গদেশে থাকা সত্বেও কর্মব্যস্ততাহেতু বাংলা ভাষাটা ভাল করে লিখতে-পড়তে শেখেন নি। অবশ্য দরকারই বা কি! অর্থ ও রাজনৈতিক খ্যাতি থাকলে বাংলা দেশের রবীন্দ্র-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে হিন্দী-বাংলার সংকর ভাষাই যথেষ্ট।

মন্ত্রীর সেক্রেটারী বলেছিল, 'ভাষণ তৈরী করব নাকি স্যার?' মন্ত্রী ভাবলেন, ভাষণটা দেখে দেখে পড়লে লোকে নির্ঘাৎ ধরে ফেলবে এটা অন্য কারও লেখা। আর উদ্ধৃতি-কণ্টকিত লেখা মুখস্ত করাও দুঃসাধ্য। তাছাড়া অত সময়ই বা কোথায়—কর্মব্যস্ত মানুষ তিনি। বললেন 'থাক।'

রাজনীতি-ঝানু বক্তৃতাবাজ ব্যক্তি তিনি। একটা বক্তৃতার জন্য অত মেহনত করবেন, ছোঃ! খাদ্য-সমস্যা থেকে মজুর-সমস্যা, গো-রক্ষা থেকে দেশরক্ষা পর্যন্ত সর্ব বিষয়ের ওপর জিহ্বা তাঁর লঘুগতি, দ্রুত, শাণিত; রবীন্দ্রনাথকে ভয় করবেন তিনি! শাণিত জিহ্বার অগ্রভাগে খেলাবেন রবীন্দ্রনাথকে।

খদ্দরে ঢেকে নিলেন মেদস্ফীত দেহটা—মাথার টাক থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত। মুখে এঁটে নিলেন বিনীত হাসির মুখোসটা।

মোটরে এসে মেদভার এলিয়ে দিলেন। সংস্থার যে কর্মীটি মন্ত্রীকে নিতে এসেছিল, সে জড়সড় হয়ে বসল মন্ত্রীর পাশে একাসনে, আড়াই হাত ব্যবধান রেখে ও মোটরের দেওয়ালের সঙ্গে দেহটা সেঁটে। মুখের ভাবটা চোরের মত। খানিকটা বাদে কাঁদ-কাঁদ গলায় একবার বলল, 'আপনার হয়তো অনেক কাজ নষ্ট হ'ল।'

'না, না।' সদ্য-পরা বিনীত হাসির মুখোসটা ঝিকিয়ে উঠল মন্ত্রীর মুখে।

মোটরের পেছনে ধূলোর ঝড় উঠল, আর ছুটে চলল দুটো পুলিশের গাড়ী। একটা জীপ, তাতে পুলিশ-সাহেব স্বয়ং এবং গোয়েন্দা বিভাগের লোক। দ্বিতীয়টা একটা ট্রাক, তার সামনের দিকে ড্রাইভারের পাশে জনকয়েক ক্ষুদে পুলিশ-অফিসার আর পেছনে ডজন দেড়েক পুলিশ—অস্ত্রশাণিত।

পুলিশ সাহেব মিঃ ডাট্ বয়সে তরুণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্র ছিলেন। সর্বভারতীয় প্রশাসনিক পরীক্ষা দিয়ে এই চাকরী পেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও সংগঠক ডাট একের পর এক সিগারেট পুড়িয়ে চলেছেন। হয়তো ছাত্রজীবনের কোন অনুষ্ঠানের কথাই ভাবছেন তিনি।

গাড়ী প্যাণ্ডেলের দরজায় এসে থামল। কতগুলো ন্যাংটো ছেলে ছুটতে ছুটতে গাড়ীর ধুলোর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছিল। গাড়ী থেকে পুলিশ নামতে দেখে তারা সন্ত্রস্ত হ'য়ে সরে গেল। কর্তৃপক্ষ পক্ষবিস্তার করে ছুটে এল। তাড়াতাড়ি নেমে এল গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী-রাও। মিঃ ডাট কর্তব্য-কঠিন মুখে মোটরের দরজা খুলে পাশে টান হয়ে দাঁড়ালেন।

মন্ত্রী তাঁর বিপুল মেদভার নামালেন। কর্তৃপক্ষের লোকেরা নানা স্তুতিবাদে মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানালেন। শেঠ ঝুনঝুনওয়ালা মুখোসের দাঁত বার করলেন। আগে থাকতেই সাজিয়ে রাখা হয়েছিল কিছু মেয়ে —তাদের দু' সারির মধ্যে দিয়ে মন্ত্রীর পথ। এক ঝাঁক মেয়ে তিনবার হুলুধ্বনি দিল। মন্ত্রী একটু হকচকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'উও কি আছে ?'

কর্তৃপক্ষ ব্যাখ্যা করলেন, 'আপনাকে মেয়েরা সওয়াগাত্ করছে।'

খুশী হলেন মন্ত্রী, 'বহুৎ ভালা—রবীন্দ্রনাথনে বহুৎ ভালা কাম কিয়েঁ।'

সমবেত শংখধ্বনি হ'ল। একটি সুন্দরী মেয়ে এগিয়ে এসে চন্দনের ফোঁটা দিল মন্ত্রীর কপালে, হাতে দিল রজনীগন্ধার ডাঁটা।

মন্ত্রী হাসলেন। তাঁর দাঁতের মধ্যে থেকে জিভের ডগাটা বার বার বাইরে এল। বল্লেন, 'তুম্ বহুৎ ভালা লড়কী আছে।'

মন্ত্রী নারী-সারির মধ্যে দিয়ে এগোলেন। পেছনে একটা মিছিল— মিঃ ডাট্, গোয়েন্দা কর্মচারী, সংবাদদাতা, কর্তৃপক্ষ, সেই বেশী চাঁদা-দেওয়া এম, এল, এ, ইত্যাদির শোভাযাত্রা।

সভার প্রধান অতিথি করা হয়েছিল অধ্যাপক বংশীবদন সমাদ্দারকে। এই নিরীহ নির্জীব প্রধান অতিথিটি এই সময় প্যাণ্ডেলের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তাকে কেউ দেখতে পেলে না। যে ছোকরাটি অধ্যাপক সমাদ্দারকে আনতে গিয়েছিল সে অনেক খোঁজাখুঁজি করে একজন ধাবমান কর্তা-ব্যক্তির কাছা চেপে ধরল: 'এই যে অধ্যাপক সমাদ্দার এসেছেন।'

রুদ্ধগতি কর্তা বললেন, 'ও, এয়েছেন! বসাও।' বলেই কাছাটি মুক্ত করে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন মন্ত্রীর পেছনের লাঙ্গুল-সদৃশ মিছিলটির পশ্চাৎভাগ লক্ষ্য করে। অধ্যাপক সমাদ্দারও পেছন পেছন এলেন— সেই লাঙ্গুলেব কম্পমান ডগাটির মত।

সুসজ্জিত সুন্দর মঞ্চ। মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির মুখে প্রসন্ন হাসি। একটু ভরসা পেলেন ক্ষীণজীবী ভীত অধ্যাপক। অন্তত একটা মুখ চেনা।

মঞ্চের একপাশে ফরাস পাতা। মধ্যে দুটো সুকোমল তাকিয়া। ঝুনঝুনওয়ালা বড় ব্যবসায়ী—গদীতে এইভাবে বসা তাঁর অভ্যাস। উদ্যোক্তারা সে-খবর নিয়েছেন আগেই। মন্ত্রীর যেন কষ্ট না হয় এখানে এসে। এত বড় একটা মানী অতিথির অসুবিধা হলে এ তল্লাটের কারুর যে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। মন্ত্রী মুখোসের হাসি হেসে বললেন, 'এ সোব আবার কেনো?'

নামালেন মেদভার। মেদিনী কাঁপল। বসলেন মন্ত্রী—গণেশ ঠাকুরটির মত। দু' পাশ থেকে দুটি ছোট মেয়ে পাখার বাতাস করতে লাগল।

অধ্যাপক সমাদ্দার ফরাসের এক কোণে প্রায় পড়-পড় অবস্থায় কোনক্রমে সন্ত্রস্তভাবে একটু বসলেন—গণেশেব ইঁদুরের মত। এম, এল, এ-টি প্রচুর স্তোকবাক্যে মন্ত্রীকে পরিতুষ্ট করতে লাগলেন একটি উপ বা অপ যে কোন ধরণের মন্ত্রী পদের প্রত্যাশী তিনি। সেই অভীষ্টের পথে শনৈঃ শনৈঃ এগুতে সুরু করছেন।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চূড়ামণি মন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে অকারণে হাত কচ-

লাচ্ছেন। ঠিক অবশ্য অকারণে নয়—একটি ঠিকাদারীর প্রত্যাশা তাঁর। কর্তৃপক্ষের উপ-চূড়ামণি কনুই দিয়ে চূড়ামণিকে সরিয়ে সামনে আসবার চেষ্টা করছেন—তাঁর ছেলেটা বি-এ পাশ করে এখনও বেকার, সেই দুশ্চিন্তার ভার মন্ত্রীর পদপ্রান্তে যদি ভবিষ্যতে নামানো যায় তার জন্যে অন্তত মুখটা চিনিয়ে রাখা দরকার। কিন্তু চূড়ামণি অনড়। অথচ জোরে ধাক্কা দেওয়াও যায় না—ভদ্রলোক তো তিনি। অন্যান্য ক্ষুদে কর্তারা পেছনে কৃতার্থ হাসিতে বিগলিত-প্রায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথের ছবির মুখ বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, এই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ আফশোষ করছেন—হায়, কবি না হয়ে যদি মন্ত্রী হতাম।

অধ্যাপক সমাদ্দার অনাদৃত কোণে পড়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথের বোকা চাউনি দেখে আরো ভড়কে গেছেন। এই দেখলেন, রবি ঠাকুর হাসছেন, এরই মধ্যে অমন ক্যাবলা-মুখ কি করে হ'ল!

পুলিশ-সাহেব মিঃ ডাট মন্ত্রী না বসা পর্যন্ত টান হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার একটু দূরে একটা চেয়ারে বসলেন। তার ওপাশে বসলেন গোয়েন্দা-বিভাগের কর্মচারীরা। একটু দূরে শ্রোতাদের মধ্যে বসেছেন ক্ষুদে পুলিশ-অফিসাররা আর একদম পেছনে দাঁড়িয়ে সাধারণ পুলিশের বাহিনী।

মাইকে একজন সংস্কৃতি-কর্মী শব্দ পরীক্ষা করছিলেন, 'এক, দুই, তিন।' কর্তা-চূড়ামণি ধমক দিলেন, 'কি হচ্ছে? এখনও তোমাদের হ'ল না? উনি কতক্ষণ বসে থাকবেন? ওঁর কাজকর্ম নেই? আর ওঁর কানের কাছে এখন চ্যাচাচ্ছ? ছিঃ! দাও, মাইক দাও। ঐ ঠিক আছে।' মাইকে এসে কর্তা-চূড়ামণি বলতে সুরু করলেন, 'মহামান্য মন্ত্রীবর শেঠ ঝুনঝুনওয়ালা আজ আমাদের মধ্যে এসেছেন। এ যে কত বড় সৌভাগ্য তা বলে শেষ করা যায় না। তাঁর মত স্বদেশপ্রেমিক, কর্মযোগী—' আর একজন কর্তা পাশ থেকে আস্তে আস্তে বললেন, 'উদ্বোধন সঙ্গীতটা তো হ'ল না।'

বিরক্ত চূড়ামণি বললেন, 'আচ্ছা এখন উদ্বোধন সঙ্গীত হবে। তারপর সভার কাজ আরম্ভ হবে।'

একটি ক্ষীণকণ্ঠ বালিকা মন্ত্রী-সম্বর্ধনার অনুষ্ঠান-প্রাবল্যে ঘাবড়ে কম্পকণ্ঠে একটি গান কোন রঁকমে উগরে দিল। ক্ষীণকণ্ঠ আরো চাপা পড়ে যাচ্ছিল কর্তাব্যক্তিদের কথাবার্তায়।

কেউ মন্ত্রীর বাতাস-কারিণীকে বলছেন, 'এই, বাতাস জোরে কর। ভাত খাস নে? গায়ে জোর নেই?'

কর্তচূড়ামণি হাঁক দিলেন, 'বয়, ডাবের জলটা কোথায়?'

ডাবের জল এল, চার গ্লাস। মন্ত্রী, এম, এল, এ, কর্তাচূড়ামণি আর অধ্যাপকের জন্য।

সমাদ্দারের গলাটা শুকিয়ে এসেছিল। ডাবের জলটুকু পেয়ে ভাল হল। অন্য একটি কারণে এই তৃপ্তি হ'ল আরো বেশী। দুনিয়ার সর্বত্র—বিয়ের বাজার থেকে মাছের বাজার পর্যন্ত—মাষ্টারদের আই, এ, এস-এর তুলনায় অনেক হীন শ্রেণীর প্রাণী বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এখানে অন্তত এই ডাবের জলের মধ্যে যতটুকু সম্মান পোরা ছিল সেটুকু অধ্যাপক পেয়েছেন মন্ত্রীর এক সঙ্গে, আই, এ-এস্ মিঃ ডাট পান নি। গর্বে অধ্যাপকের ক্ষীণ বুক একটু ফুলে উঠল, আর পেটটা ডাবের জলে। আর মস্তক তিনি ফুলিয়েই এনেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মোটা মোটা বইয়ের সার-নির্যাস পুরেছেন খুলির খোলের মধ্যে। মহাভাষণ দেবার জন্য খুশী জিভটা শাণ দিতে লাগলেন।

হঠাৎ দেখলেন, রবীন্দ্রনাথের চোখ দুটো যেন হাসছে, চোখে মিটিমিটি ঠাট্টার হাসি। ক্রমে সে হাসিটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। অধ্যাপক নিজের দৃষ্টিকে সরিয়ে নিলেন সেই চোখাখোখি থেকে।

রেসের ঘোড়ার মত চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেম অধ্যাপক। প্রথমেই যেন তাকে বলতে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি—তাঁর আগ্রহ-উন্মুখ মুখে ছাই দিয়ে প্রথমে বললেন কর্তাচূড়ামণি। ইনি সাতাশ বছর আগে সর্বসাকুল্যে সাতঘণ্টা কবি-সান্নিধ্যে কাটিয়েছিলেন। সেইটি ভাঙ্গিয়ে

এই সাতাশ বছর কাটিয়েছেন! দেড়শো বার বলা গল্পই তিন আবার সুরু করলেন, 'গুরুদেবকে উচ্ছে ভেজে দিয়েছিলেন সেদিন আমার স্ত্রী। গুড় দিয়ে ভাজা নয় সে উচ্ছে, কিন্তু কবি অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে সেই উচ্ছে ভাজা খেয়েছিলেন—মুখ বিকৃত না করে। পত্নীপ্রেম সত্ত্বেও আমি বিকৃত-মুখ হয়েছিলাম, গুরুদেব হন নি। বরং মনে হচ্ছিল যে তিনি যেন ভীম নাগের সন্দেশ খাচ্ছেন। এতে কবির সহিষ্ণুতার, আমার স্ত্রীর রন্ধন-অনভিজ্ঞতার এবং আমার সত্যবাদিতার প্রমাণ মেলে।.........'

অধ্যাপকের চোখ পড়ল রবীন্দ্রনাথের ছবির দিকে। কবির মুখটা উচ্ছে-ভেতো হয়ে উঠেছে।

কর্তাচূড়ামণির থামবার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না। তবু থামতে হ'ল। দর্শকবা চঞ্চল হয়ে পড়ছে। এবং তাদের অসন্তোষ বেশ মুখরিত। তাদের দোষ দেওয়া যায় না। তাদের টিকিট বিক্রী করা হয়েছিল, থুড়ি, সংস্থার সভ্যপদ অর্জন কবানো হয়েছিল (ওঃ, আর একটু হলেই প্রমোদকরের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিল আর কি।) চিত্রনটি পৃথুলা দেবী আসবেন বলে। অথচ তিনি এখনও এসে পৌছন নি, গাড়ী ক'রে লোক নাকি গেছে তাঁর খোঁজ করতে। অনুষ্ঠানে ঘোষকের কাজ করবার কথা তাঁর। বলতে গেলে তিনিই তো পুরোহিত। টাকাটা দর্শকদের প্রায় মাটি হয় হয় এমন সময় উচ্ছের গল্প কার ভাল লাগে। হোক না গুরুদেবের উচ্ছে খাওয়া, তা বলে কড়কড়ে পাঁচটা টাকা উচ্ছেতে উশুল হবে? দর্শকদের আরো বলা হয়েছিল, আবৃত্তি করতে আসবেন আর একজন চিত্রনটী তন্বী ব্যানার্জী। তিনিও আসেন নি এখনও। এতেও অবশ্য অনেক নৃত্যরসিক দর্শক খুশী হয় নি, সভ্যপদ অর্জন করবার সময় জিজ্ঞেস কবেছিল, 'ওসব মাষ্টারদের তো হর-হামেশা বায়োস্কোপ-থেটারে দেকৃচি। বলি, সুন্দরী মেয়েছেলেদের লেত্যলাট্য-ফাট্য আচে?'

'নিশ্চয়ই। তাও আছে।' উদ্যোক্তরা অনুষ্ঠানকে জনপ্রিয় করবার জন্য চেষ্টার কসুর করে নি।

এ হেন দর্শকদের ঠকানো যায় না। এক দেখিয়ে বিয়ে পাকা করে আসরে অন্য মেয়ে গছানো যায় না। এরা শেয়ানা দর্শক।

একটি ছোকরা-কর্মী অধ্যাপকের কানের কাছে বিড়িগন্ধী মুখটা এনে বলল, 'আপনি স্যার এবার বলুন।'

অধ্যাপক এই শেয়ানা দর্শকদের সামনে অসহায় বোধ করছিলেন। অতি-তাঁদড় ছেলেদের ক্লাসে ঢুকেও এত নার্ভাস্ বোধ করেন নি তিনি। যাই হোক, বই-ঠাসা মাথাটার এক কোণে একটুখানি ঘিলু ছিল অধ্যাপকের। তিনি খুব সংক্ষেপে ভাষণটা শেষ করলেন। দুঃখ হ'ল রাত জেগে উদ্ধৃতি মুখস্ত করে একটি মহাভাষণ তিনি তৈরী করেছিলেন। সেটি এই দর্শকদের মাঠে মারা গেল। মহাভাষণ সুরু করলে অবশ্য অধ্যাপককেই স্বয়ং মারা পড়তে হত।

দর্শকরা ভদ্রই বলতে হবে। 'চেপে যা', 'পাণ্ডিত্য ফলাতে এসেছে', 'শালা' ইত্যাদি মুখের মন্তব্য মাত্র করেছে, বার দুয়েক উচ্চ শব্দে হাতের তালি দিয়েছে; কিন্তু অধ্যাপকের মুখে তাদের হাত থেকে থান ইঁট এসে পড়ে নি।

এম, এল, এ, উঠে বললেন, 'এইবার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলবেন মাননীয় মন্ত্রী শেঠ ঝুনঝুনওয়ালা। অবাঙ্গালী হয়েও এত বড় বাঙ্গালী সংস্কৃতির অনুরাগী দেখা যায় না। তাঁর মত অমায়িক বিনয়ী' ইত্যাদি ইত্যাদি…।

মন্ত্রী অতি কষ্টে মেদভার তুললেন। খটাস করে উঠে দাঁড়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছেলে মিঃ ডাট।

সবাই উৎকণ্ঠিত আগ্রহে স্তব্ধ হ'ল। এঁর জন্যেই তো এত। অতএব নিশ্চয়ই সাংঘাতিক একটা কিছু বলবেন। অতি-নতুন, অতি আশ্চর্য কিছু।

মন্ত্রী বললেন, 'ভাইয়োঁ অওর বহ্নোঁ, হামাকে আপলোগ আজ যে আদর করিয়েছেন, হামি তার যোগ্‌গ্‌ নহীঁ। হামি এক সাধারণ গরীব মামুলী আদমি। রঅভীন্দ্রনাথ বহুৎ বড়া ভারী

আদমী ছিলেন। রঅভীন্দ্র-সঙ্গীত, রঅভীন্দ্র-কাব্‌ব্‌ ভারী আচ্ছা চীজ। উনকা গানা হামাদের রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত হইয়েছে। রঅভীন্দ্রনাথ ভারী বড়া জীনিয়াস্‌। বড়া বড়া কিতাব লিখিয়েছেন, অওর বাজারমে উ সব কিতাবের ভারী কাটতি। ইয়ে তো জীনিয়াস-কে হি হোতা। দেখিয়ে, হামার ভাই ছোট্টু বিড়িপাত্তাকা বেওসা করেছিল। লেকিন জীনিয়াস নহী, উসকা সব পাত্তা গুদামমে পচে গেলো। বাজারে কাটল না। রঅভীন্দ্রনাথ জীনিয়াস, উস লিয়ে উনকা কিতাব—হজারোঁ পাত্তাকা কিতাব—উসকা বহুৎ কাটতি। আচ্ছা হামি অওর বিশেষ কিছু বলবে না। হামি ভারী দুঃখিৎ আছে—হামি সবক্ষণ হিঁয়া থাকতে পারবে না, হামার এক জরুরী কাম আছে। আভি হাম যাবে।'

করতালির ঝড় উঠল।

এম, এল, এ, মাইকের কাছে এসে চিৎকার করে বললেন, 'জয় ঝুনঝুন-ওয়ালাকা—'

'জয়।' সাড়া দিল অনেকে।

মন্ত্রী হাত জোড় ও দাঁত বার করলেন। ঐ পোজেই নামলেন মঞ্চ থেকে। বিনীত হাসির মুখোসটা মুখের সঙ্গে খাপে খাপে এঁটে রইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন ডাট্‌ কর্তব্য-কঠিন মুখে টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

কর্তাব্যক্তিরা মন্ত্রীকে পাশের বাড়ীতে জলযোগ করাতে নিয়ে গেলেন। অধ্যাপক সমাদ্দার পড়ে রইলেন।

হঠাৎ একটা তুমুল আনন্দধ্বনি জাগল। চিত্রাভিনেত্রী পৃথুলা দেবী ও তন্বী ব্যানার্জী এসে পৌঁছেছেন।

অধ্যাপক সমাদ্দার দেখলেন, তাঁর দিকে কারও মনোযোগ নেই। একদলের মন মন্ত্রীর দিকে, আর একদলের মন দেবীদ্বয়ের দিকে। অধ্যাপকের জন্য কোন মন অবশিষ্ট নেই। এখন কি কর্তব্য, ঠিক করতে পারলেন না অধ্যাপক। বাড়ী থেকে আসবার সময় ভেবেছিলেন, মন্ত্রীর সঙ্গে

ভাল একটা খাবারের ডিশ মিলবে। বাড়ীতে বলেও এসেছিলেন যে রাতে হয়তো খাবেন না। এখন উদরে শূন্যবাদের বিস্তৃতি দুঃসহ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেই শূন্যতার ঋণ পূরণ করছে দর্শকরা, কর্ণকুহরে তুমুল অবিশ্রান্ত আনন্দধ্বনি পরিবেষণ ক'রে। দেবীদ্বয়ের অভিনন্দন এত উচ্চকণ্ঠ যে অধ্যাপক কানের পর্দা ফাটার ভয়ে উঠে পড়লেন। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা; না, এখনও এসে কেউ একবার জিজ্ঞেস করল না যে তিনি চা খাবেন কি না।

হঠাৎ আবার নজর পড়ল রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির দিকে—বিরক্ত, বক্রত, বীভৎস একটা মুখ। সে দিকে তাকিয়ে ভয় করতে লাগল অধ্যাপকের। এমন নারকীয় মুখ রবীন্দ্রনাথের কোনদিন দেখেন নি তিনি। প্রায় ছুটেই বেরিয়ে পড়লেন অধ্যাপক।

নিঃ বাঁঃ বঃ সাঃ সঃ

৭ই ডিসেম্বর। সমগ্র জগতের দৃষ্টি আজ বাঁশবেড়ের ওপর নিবদ্ধ। বিশ্বের সকল কাগজে বাঁশবেড়ের সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ বা রিপোর্ট বেরিয়েছে—ভারতবর্ষের তো কথাই নেই। এখানে এসে দেখলাম, সত্যিই অভূতপূর্ব ব্যাপার। একেবারে অত্যদ্ভুত। পেল্লায় মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। 'পেল্লায়' শব্দটা প্রাকৃতজনোচিত কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন শব্দ দিয়ে সেই প্রলয় কাণ্ডকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সারা ভারতবর্ষের নানা যায়গা থেকে সেরা বংশদণ্ড কাষ্ঠ, ত্রিপল, বস্ত্রাদি ও তাকিয়া আনা হয়েছে। কোলকাতা থেকে একজন প্রখ্যাত শিল্পী এসেছেন তিনমাস আগে; এতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি মণ্ডপ-মণ্ডন করেছেন।

কিছু প্রতিনিধি ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা শাল-মণ্ডিত হয়ে বংশবাটিকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখছেন, এবং মূর্ছিত হচ্ছেন। একজন বিলেত-ফেরত ডাক্তার শুধু এইজন্যে মজুত রাখা হয়েছে। (বলা বাহুল্য, আমাকেও ডাক্তারের সাহায্য নিতে হয়েছিল।) অভ্যর্থনা সমিতি পদমর্যাদা অনুসারে বাসস্থান ঠিক করেছেন নইলে মাননীয় অতিথিদের মানহানি হতে পারে।

অভ্যর্থনা সমিতি আর একটি মহৎ কাজ করেছেন। একটি পুস্তিকা ছেপে তাতে বংশবাটিকার অতীত ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক কমনীয়তা ও বর্তমান দ্রষ্টব্যস্থানের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। এই পুস্তিকা প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতরিত হচ্ছে। সাংবাদিক হিসেবে আমরাও পেলাম একখানা। পড়ে দেখি, সাংঘাতিক ব্যাপার। বংশবাটিকার ওরফে বাঁশবেড়ের অতীত রাজস্থানের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর ও গৌরবময় নয়। আমি তো পড়ে হাঁ। কে জানত, আমাদের বাঁশবেড়ের পেটে-পেটে এত। সত্যি, দেশের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা কত অজ্ঞ!

৮ই ডিসেম্বর। নিখিল বাঁশবেড়ে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের আজ উদ্বোধন হোলো। উদ্বোধন করলেন সারা ভারত রাজ্যপাল সমিতির অবৈতনিক সভাপতি মহামান্য শ্রীবিশালব্রহ্ম হচ্‌পচ্‌কার। শ্রীহচ্‌পচ্‌কার তাঁর বক্তৃতায় রাজনীতি থেকে গো-পালন-পদ্ধতি পর্যন্ত অবলীলাক্রমে বিচরণ করলেন। সে একটা দেখবার—বা শোনবার মত জিনিস। আমাদের সাংবাদিকদের অনেক কিছু জানতে হয়—ঐ পেশা আমাদের। এঁকে দেখে মনে হোলো, আমরা নেহাৎ শিশু। সর্বজ্ঞতায় আমরা ওঁর কাছে এখনও পঞ্চাশ বছর শিক্ষা নিতে পারি। একটা বিষয় থেকে আর একটা বিষয়ে কি সুন্দর যে গেলেন! যেন শাখা থেকে শাখান্তরে চলমান শাখামৃগ—পনেরো মিনিটে পঞ্চান্নটি শাখা অতিক্রম করে হাততালির ঝড় তুলে সার্কাসের কুশলী খেলোয়াড়ের মত দেহ ঈষৎ ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করে (অথবা গ্রহণ করে) নিষ্ক্রান্ত হলেন।

শ্রীহচ্‌পচ্‌কারের বক্তৃতা পি-টি-আই পরিবেশন করছে, অতএব আমার পুনরুক্তি অপ্রয়োজন। এ সম্মেলনের অন্যান্য বিবরণ—যা পি-টি-আই দেবে না, সেইসব আমি কিছু কিছু জানাচ্ছি!

মণ্ডপ-সজ্জা এক কথায় চমৎকার। প্রধানত গালে চুণ-মাখা হাঁড়ি (কালি-মাখা ছিল না, লক্ষ্য করে দেখেছি।) ও উপুড়-করা চুপড়ি দিয়ে সাজানো হয়েছে। লোকশিল্পের মাথায় যে ঝুড়ি আর ভাণ্ডারে যে শূন্য হাঁড়ি একথা শিল্পী বেশ উত্তমরূপেই জানেন মনে হোলো।

প্রায় হাজার চারেক লোকের বসবার মত জায়গা করা হয়েছে। কিন্তু কোন অধিবেশনেই শ' দেড়েকের বেশি লোক বসে না। ধূ ধূ করে এক অপরূপ শূন্যতা। এইখানে প্রেসের জন্য নির্দিষ্ট টেবিলে বসে এই সহস্র আসনের সারি দেখতে বড় ভাল লাগে। আঃ, কি সুন্দর শূন্যতা ফাঁকা জায়গায় বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে শরীর ভাল করতে হলে এই ধরণের সম্মেলনে আসা উচিৎ।

একজন কর্তাব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ডেলিগেট কি এই দেড়শ জন?'

তিনি আমার প্রশ্নে বেশ ক্ষুব্ধ হলেন, 'এত বড় সম্মেলনে দেড়শ প্রতিনিধি! আপনি তো মশাই আচ্ছা লোক।'

'মাফ করবেন। দুঃখিত। এঁরা কতজন।'

'পৌণে চার হাজার।'

'এ—ত! এঁরা সব গেলেন কোথায়—দেখছিনে তো।'

'বাইরে গিয়েছেন ওঁরা।'

'প্যাণ্ডেলের দেড়শ জন যাতে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করতে পারেন, তারই জন্যে কি? কিছু মনে করবেন না আমি সাংবাদিক।'

'ওঁরা কেউ গিয়েছেন বংশবাটিকার দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে, কেউ গিয়েছেন ক্রেতব্য বস্ত্র কিনতে। বাকিরা ভোক্তব্য দ্রব্য ভোগ করছেন রেস্তোরাঁয়।'

'এই দেড়শ জনই বা শ্রোতব্যের জন্য এত উৎকর্ণ কেন?'

'কে বললে এরা উৎকর্ণ? এর মধ্যে শ' খানেক গল্প করছে, বাকি পঁচিশ জন ঘুমোচ্ছে।'

'এই এক শো জন এখানে বসে গল্প করে ডিস্টার্ব করছে কেন?'

'ডিস্টার্ব কি মশাই! বরং ওরা বক্তাকে ইন্‌স্‌পায়ার করছে। ভেবে দেখুন তো ঐ একশো জন যদি না থাকত, বক্তার কি শোচনীয় অবস্থা হোতো। আমাদের তাহলে পয়সা দিয়ে লোক ভাড়া করে আনতে হোতো। কত খরচার ব্যাপার সেটা ভাবুন তো।'

না ভেবেই প্রশ্ন করে বসলাম, 'এঁদের কি আপনারা পয়সা না দিয়েই এনেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তবে এত জায়গা থাকতে এরা এই জায়গায় বসে গল্প করছেন কেন? এরাও ক্রেতব্য-দ্রষ্টব্যের জায়গায় গিয়ে—।'

'হু, সেটা হয়তো যেতেন। কিন্তু ওঁদের মেরেছে ভগবান।'

'কি রকম?'

'ওঁদের কারুর বাত আছে, কারুর শ্লেষ্মাব ধাত ইত্যাদি। তার মানে বাইরের ঠাণ্ডা সয় না। আমরা প্রতিবারই বাঁশ-কাঠ-ত্রিপলের সঙ্গে এই

রকম কিছু ঠাণ্ডাকাতুরে প্রতিনিধি আমদানি করি সভা গরম রাখবার জন্য।'
আমাদের এই আলোচনার সময় কী একটা শাখার শাখাপতি অবাধ ভাবে ভাষণ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কথা বলতে বলতেও শুনতে পাচ্ছিলাম তাঁর ভাষণের ভগ্নাংশঃ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বঙ্গদেশ প্রভৃতি শব্দ। বেশ লাগছিল। ভগ্নাংশগুলো ভাষণ-স্রোতে চলমান নুড়ির মত কলতান তুলছে, এদিকে আমাদেরও একশো জনের ঘুমপাড়ানিয়া সুরের গুঞ্জনে পঁচিশ জনের মৃদু নাসিক্য-ধ্বনি। সব মিলে বিচিত্র মধুর এক ঐকতান। তবু বৈচিত্র্যের সবটুকু তখনও দেখা হয় নি। বাইরে এলাম। প্যাণ্ডেলের বাইরে সুবৃহৎ রেস্তোরাঁ প্রতিনিধিদের সমাগমে গমগম করছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতি যে আজকাল বৈঠকখানা-চণ্ডীমণ্ডপ ত্যাগ করে রেস্তোরাঁয় অধিষ্ঠান হয়েছেন, এ খবর উদ্যোক্তারা জানেন, এবং মণ্ডপের বাইরে একটি সুবৃহৎ পানীয়-ভক্ষ্য-বিক্রয়-কেন্দ্র স্থাপন করছেন। আর বাঙ্গালীরা যে কত সাহিত্য-সংস্কৃতি-অনুরাগী তা এই পান-ভোজন-কেন্দ্রের জন-সমাগম দেখে বোঝা যায়।

সেই জনারণ্যের মধ্যে আমি কবি-সাহিত্যিক খুঁজতে শুরু করলাম। এ কথা যে কেউ স্বীকার করবেন যে সাহিত্যিক খুঁজে বার করা গরু খুঁজে বার করার চেয়ে অনেক কঠিন। কারণ গরুর দুটো শিং ও একটি পুচ্ছ অন্তত আছে, সাহিত্যিকদের তা নেই। অবশ্য অনেক সাহিত্যিক যে শৃঙ্গহীনতা সত্বেও চমৎকার গুঁতোতে পারেন—গুঁতোনো-বিদ্যেয় সিদ্ধমস্তক তা আমি জানি। কিন্তু অনেকে বলে থাকেন, সাহিত্যিকদের নাকি কারুর কারুর ল্যাজ গজায়। এ কথা সর্বৈব মিথ্যা। আমি বিশেষ অনুসন্ধান করে দেখেছি যে এবম্বিধ প্রত্যঙ্গ-উদ্ভব সাহিত্যিকদের হয় না। আমার দৃঢ় ধারণা, যাঁরা এই লাঙ্গুলবাদে বিশ্বাসী তাঁরা সাহিত্যিকদের সঙ্গে অন্য কোন প্রাণীকে গুলিয়ে ফেলেছেন, অথবা কোন অদৃশ্য লাঙ্গুলের তাঁরা অনুমান করে থাকেন।

কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হোলো, হায়, সেই অদৃশ্য বস্তুটি যদি দৃশ্যমান হোতো, তবে আমার কত পরিশ্রমই না বেঁচে যেত। অন্য

লোকদের থেকে সাহিত্যিকদের আলাদা করা দুঃসাধ্য। ব্যাপার দেখে-শুনে আমার মাথায় হাত। দেখে তো নয়ই, এমন কি শুনেও সাহিত্যিকদের আলাদা করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে বাংলাদেশে। এই জোলো স্যাঁৎসেতে নারীপ্রেমিক ব-দ্বীপটায় বয়ঃসন্ধিকালে একটা ব্যামো ব্যাপক আকারে দেখা দেয়—কাব্য রচনার ব্যামো। হিষ্টিরিয়া জাতীয় ব্যাধি এটা; দাঁত-মুখটা খিঁচোনোর বদলে ললিতভাবে বিকশিত করে শুধু এই মাত্র তফাৎ। বাংলাদেশের মা-বাপেরা ছেলেমেয়েদের যতদিন পর্যন্ত না ঐ ব্যাধি এক ধক্কল হয়ে যায়, ততদিন স্বস্তি বোধ করেন না। একবার হয়ে সারলে ওটা টিকের কাজ করে। এইদিক থেকে দেখলে সাহিত্যিক কে নয়? এখানে সাহিত্যিক বাছতে গাঁ উজোড়। সবাই লেখক। এঁরা স্বচ্ছন্দে রবি ঠাকুরের কণ্ঠটিকে একটু বিকৃত করে গাইতে পারেন, 'আমরা সবাই লেখক এই লেখক সম্মেলনে।'
তাছাড়া আর একটা কথা আছে। সত্যি কথা বললে, না লেখে কে? চিঠি, দরখাস্ত, বিয়ের পদ্য, ধোপার হিসেব, ফর্দ, মুদির খাতা, লেজার, ল্যাট্রিন-লিটারেচার ইত্যাদির একটা না একটা সবাই লেখেন। অতএব ব্যুৎপত্তির দিক থেকে সবাই লেখক। তবে আমি মূর্খ সাংবাদিক। আমি নাম শুনেছি এমন সাহিত্যিক সাকুল্যে পাওয়া গেল সাড়ে তিনজন। একজন কবিতা লিখে থাকেন শুনেছি; পড়িনি, বুঝবনা ভয়ে। আর একজন ঔপন্যাসিক, যিনি অনর্গল গ্রন্থ প্রসব করেন, কিন্তু কি প্রসব করছেন তা নিজেই জানেন না। আর একজন রম্যরচক; মুখরোচক চানাচুর লিখে সম্প্রতি বাজার গরম করেছেন। আর একটি তরুণ ছোকরা দাদাদের পোঁ হিসেবে কচ্ছলগ্ন থেকে দু' তিনটি লেখা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। একেই আমি ধরেছি অর্ধ।
নিজের মূর্খতায় নিজেই লজ্জা পেলাম। চার হাজার সাহিত্য প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র আমি সাড়ে তিনজনের নাম জানি! এঁরা সাড়ে তিন জন রেস্তোরাঁয় সাহিত্যচর্চা করছিলেন। পেছনে চা-এর কাপ নিয়ে বসে চুরি করে শুনতে লাগলাম। চৌর্যে সাংবাদিকের অধিকার আছে।

ঔপন্যাসিক বললেন, 'যাক, অল্প পয়সায় গিন্নীর সখটা মিটল। তীর্থটা করিয়ে নিলাম। সিঙ্গল ফেয়ার ডবল জার্নি যখন পাওয়া যাচ্ছেই, তখন গিন্নীকে একটা ডেলিগেট করিয়ে দিলাম। সেই জন্যেই এবার আসা, ঐ তোমাদের—'

কবি উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেটার কি হোলো? শ্রী বেদুইন বরাটের সঙ্গে কথা বললেন?' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শ্রীবেদুইন বরাট সরকারী মহলের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। সরকারের সাহিত্য-পুরস্কার দেবার ব্যাপারে এঁর বিশেষ হাত আছে।

ঔপন্যাসিক বললেন, 'না, বেদুইনদাকে তো ধরতেই পারছিনা, এত লোক সব সময় ঘিরে রয়েছে ওঁকে!'

'কেন, কেন, সবাই এবারের 'সাহিত্য-শ্রী' হতে চায় নাকি?'

'আরে না, না, এখানে আর লেখক কোথায় আমরা ছাড়া!'

'তবে?'

'ওরা কেউ চাকরির উমেদার, কেউ পদোন্নতি চায়, কেউ ছেলের একটু সুযোগ-সুবিধের জন্য চাটুকারিতা করছে। আমাদের মত প্রিন্সিপ্‌ল্ মেনে আর কটা লোক চলে বলো। বেদুইনদা অবিশ্যি এই খোসামোদ জিনিসটা একদম পছন্দ করেন না। উনি তো আমায় বলেন, আমায় স্নেহ করেন কারণ আমি কক্ষনোও ঐ সব ইয়ে—'

'তাহলে কিছু কথা হয়নি ওঁর সঙ্গে!'

'ঐ বল্লাম যে! হবে কি করে! সরকারী কর্মচারী আর কেরানির দল তাকে এক মুহূর্ত ছাড়লে তো। এ সম্মেলনের নাম হওয়া উচিৎ ছিল বাঙ্গালী কর্মচারী সম্মেলন।'

'তাহলে উপায়?'

'অত উতলা হোয়ো না, ওঁর স্ত্রী—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শ্রীমতী বরবটি বরাট।'

'হ্যাঁ, বরবটিদির সঙ্গে কথা বলেছি।'

'উনি কি বললেন? কিছু 'হোপ' আছে?'

'বরবটিদি তো বেশ আশাই দিলেন।'

'কি বললেন ?'

'বললেন—এবার তোমার হয়ে যাবে।'

'দেখবেন দাদা। জমি কিনে রেখেছি 'সাহিত্য-শ্রী'র টাকায় বাড়ি করব এই ভরসায়। আমার গিন্নীর বড় সাধ একখানা বাড়ির।'

'হয়ে যাবে হে তোমার এবার। জ্যোতিষার্ণবকে দিয়ে যে হাত দেখালে তা উনি কি বললেন ?'

'উনি তো বললেন, হয়ে যাবে ; তবে একটু উদ্যোগ নিতে হবে।'

'উদ্যোগ নিয়েই তো এখানে আসা। নইলে এই হতভাগা জায়গায় ভদ্রলোক আসে—!'

'চুপ চুপ দাদা। কেউ শুনে ফেলবে।'

'উদ্যোগ মানেই তো বেদুইনদা, কি বল ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সে ঠিক হবে! আমি যখন ভার নিয়েছি, তখন তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে পারো।'

'ঘুমোতেই পারছি না তো নাক ডাকিয়ে! আমার ভয় ঐ অষ্টরম্ভা ঘোড়ুইকে। ও ভয়ংকর চেষ্টা করছে—ও নাকি মন্ত্রীদের হাত করে বসে আছে।'

এর পরে ওঁরা অষ্টরম্ভাকে চটকে প্রমাণ করে দিলেন যে ওর ভেতরে শাঁস কিছু নেই—বীচে কলা।

সাহিত্যের শ্রী সম্পর্কে এঁদের মনোজ্ঞ আলাপ-আলোচনা শুনে ক্যাম্পে ফিরলাম সেদিনের মত।

৯ই ডিসেম্বর। আজ একটা মজার ঘটনা ঘটেছে। একটি অধিবেশনে এক ক্ষীণকায় বঙ্গ-তরুণ (সে নিজেকে সাহিত্যিক বলে পরিচয় দেয়। এই সুধীসমাজে তার স্পর্ধাটা লক্ষণীয়) হঠাৎ মঞ্চে উঠে বলে, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির ওপর একটা আলোচনা হোক।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা হাসির ভরা-কোটাল বান বয়ে গেল। যারা বায়ু

ও বক্তৃতা সেবন করছিল তারা তো হাসলই, যারা নিদ্রিত ছিল, তারাও তিপান্ন সেকেণ্ড তাদের নিদ্রা-বিরতি রেখে তিনবার হেসে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। বাতাক্রান্তরা হাসতে গিয়ে মাঝপথে হোঁচট খেয়ে থেমে গেল—অত প্রবল হাসির দমক তাদের ব্যাধিগ্রস্ত দেহে সহ্য হোলো না। যারা মুচমুচে বক্তৃতা সহযোগে চা-পান করছিল, তারা হাসতে গিয়ে বিষম খেয়ে ভীষণ বিপত্তি বাধাল। তবু বিষম খেতে খেতেও তারা হাসল। বিষম-কাশি, অট্টহাসি আর গরম চা অনর্গল তাদের মুখ দিয়ে ঐকতানের লয় মেনে বেবোতে লাগল। এই এত রকমের হাসি দল বেঁধে তেড়ে ফুঁড়ে ছুটে এলো সেই তরুণের দিকে। আর শোনা গেল বিভিন্ন মন্তব্য:

'নিখিল বাঁশবেড়ে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য-আলোচনা! ছোকরা পাগল।'

'না, না, ছোকরার বয়স কম। তাই একটু—'

'একটু? তুমি যে ওর সঙ্গে পাগল হলে। বয়স কম তা হয়েছে কি! সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটাও একটু থাকতে নেই। রাইটার্স বিল্ডিং-এ কি লেখক সম্মেলন হয়। ভারতের সব রাইটার্স বিল্ডিং থেকে রাইটাররা এখানে সম্মিলিত হয় এই সাধারণ তথ্যটুকু পর্যন্ত জানে না ছোকরা!'

'এখানে যদি সাহিত্যের কচকচি শুরু হয়; আসছে বার থেকে তাহলে আর আসব না আমি।'

'আমিও না। বচ্ছরান্তে একবার আসি একটু মেলামেশা আমোদ-ফুর্তি করতে, তা এখানেও যদি সাহিত্যের ক্লাস খোলা হয় তবে আর—!'

'বছরে মাত্র একবার! তাও এদের চক্ষুশূল।'

মেয়েমহলে যে যেখানে যে-অবস্থায় এই দুর্মুখ বঙ্গতরুণের কথা শুনল, সেই সেইখানে সেই অবস্থায়ই মড়া কান্না কেঁদে উঠল। নিজেদের বিচিত্র পোশাক আর চিত্রিত দেহ দেখাবার এমন স্থানটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। কোথায় স্বামীর উন্নতির কথা গল্প করে এত সুখ! পুরো এক বৎসরের কত কেচ্ছা গেঁজিয়ে থাকে মনের

মধ্যে—সেগুলোকে রসিয়ে পরিবেশন করবার এমন জায়গা আর ভূ-ভারতে কোথায় আছে? এই সুখ কেমন করে ছাড়বে কামিনীর দল? কাঞ্চন-কৌলীন্য দেখবার ও শোনাবার এমন স্বর্গভূমি মর্ত্যলোকের আর কোথায় পাওয়া যাবে? আর এই সবের ওপর সারাক্ষণ কী সুন্দর ভণভণ করে সংস্কৃতির একটা ওড়না! এই স্বর্গ থেকে বিদায়ের দিন কি ঘনিয়ে এলো তাদের?
না। সভাপতির রুল-এর, থুড়ি, রুলিং-এর এক ঘায়ে দুর্মুখ স্তব্ধ হয়েছে। বিপদের কালো মেঘ বাঁশবেড়ের আকাশ থেকে সরে গেছে। সবার মুখে হাসি ও খৈ ফুটেছে।

১০ই ডিসেম্বর। আজ সন্ধ্যায় কবি-সম্মেলন হোলো। চল্লিশ জন কবি কবিতা পড়লেন। সভাগৃহে গুণে দেখলাম, সভাপতি ও সাংবাদিকদের বাদ দিয়ে মোট একশো কুড়িজন; প্রত্যেক কবির সঙ্গে দু' জন করে বন্ধু এসেছেন; এক নম্বর কবি কবিতা প'ড়ে আর প্যাণ্ডেলে থাকলেন না। অন্যের কবিতা শোনার আগ্রহ তাঁর নেই—যা বাজে লেখে ওরা, সহ্য করা যায় না! তাঁর সঙ্গে তাঁর বন্ধুদ্বয়ও বাইরে গেলেন। দ্বিতীয় কবিও কবিতা-পাঠান্তে তাঁর বন্ধুদ্বয়কে নিয়ে বাইরে চা খেতে চলে গেলেন। তৃতীয় কবিও সবান্ধবে মহাজনদের পদচিহ্ন অনুসরণ করলেন। এমনিই চলল। চল্লিশ নম্বরের কবি যখন কবিতা পড়লেন, তখন সভাপতি ও সাংবাদিকদের বাদ দিয়ে শ্রোতার সংখ্যা—দুই।

১১ই ডিসেম্বর। আবার এক অর্বাচীনের ঝামেলা। নিখিল বাঁশবেড়ে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য আলোচনা না করবার যে পবিত্র ঐতিহ্য এখানে প্রতিপালিত হয়, তাকে লাঞ্ছিত করতে এসেছিল সেদিন এক অর্বাচীন, আর আজ একজন বলল 'সভাপতি নির্বাচন করা হোক।'
এবার কেউ হাসল না। এই নাস্তিক-ঔদ্ধত্যে হাসি আসা সম্ভব নয়।

মুখগুলো বরং কঠিন থেকে কঠিনতর হয়। গনগনে অঙ্গারের মত জ্বলতে থাকে সবার ক্রোধদীপ্ত চোখ। মেয়েরা ভীষণ বিপদ আশংকায় হায় হায় করে ওঠে। ছোকরা বলে কি! শালগ্রাম-শিলায় পদাঘাত করা এর চেয়ে অনেক সহজ। চিরস্থায়ী সভাপতি আছেন বেদব্যাস ব্রহ্ম। বাণীর বরপুত্র। সরস্বতী স্বয়ং তাকে বছরের পর বছর মনোনীত করে যাচ্ছেন। ওঁর মৃত্যুর পর ওঁর পুত্র হবেন, সরস্বতী ঠিক করে রেখেছেন। ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ এই বেদব্যাস ব্রহ্ম।
বলা বাহুল্য, এবারও বেদব্যাস ব্রহ্মের সভাপতিত্ব খণ্ডিত হয়নি। নাস্তিক ছোকরাটির দেহের কয়েকটি অংশ খণ্ডিত হয়ে থাকতে পারে।

১২ই ডিসেম্বর। এবার বিদায় নেবার পালা। আবার আসছে বছর মিলবে সবাই। বাংলা সাহিত্যের জয় হোক। বাঙ্গালীর সংস্কৃতি দিনদিন কলার ন্যায় বৃদ্ধিলাভ করুক। বেঁচে থাক সারা ভারতের রাইটার্স বিল্ডিং-এর বড়-ছোট রাইটারবরা। বাঁশবেড়ের ঐতিহাসিক সম্মেলন বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পতাকাস্থান বলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে বিবেচিত হবে।

এ সপ্তাহটা কেমন যাবে

আশুবাবু রবিবারের কাগজটি নিয়ে বসেছেন। পড়বেন। 'জয় মা চণ্ডী' বলে কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে কাগজটা খুললেন আশুবাবু।

আশু বাঁড়ুজ্যে বড় ভক্ত লোক। বড় বিশ্বাস তাঁর দেব-দ্বিজে এবং আরো অনেক কিছুতে। এ ঘোর কলি যুগে যখন বিশ্বাস বস্তুটা কলকাতার বাজারে তপসে মাছের চেয়েও দুর্লভ, তখন তাঁর মত মানুষ সত্যিই দর্শনীয় ও স্মরণীয়।

তিনি জানেন, বিশ্বাসে ও সাধন-ভজনে শুধু হরি নয়, বড় সাহেবের মন পর্যন্ত পাওয়া যায়। আর তর্কে সব কিছুই দূর, এক গিন্নীর মুখ নাড়াই মাত্র নিকট। সেই জন্য তিনি তর্ক করেন না—বাড়িতে গিন্নীর সঙ্গে নয়, অফিসে সাহেবের সঙ্গে নয়। শুধুমাত্র বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাসের পরিধির মধ্যে উপ অপ কত দেবতার যে বাস তার সঠিক আদমসুমারী আজও পর্যন্ত হয় নি। তাগা-তাবিজ মাদুলি যা তাঁর দেহে আশ্রয় পেয়েছে তার ওজন দেড়-সেবটাক হবে; সেগুলো দেহকাণ্ড থেকে ডুমুরের মত ঝুলছে। গাছ পাথর থেকে তেত্রিশ কোটি দেবতা পর্যন্ত তাঁর সমদৃষ্টি। তাঁর মাথার সব শূন্যতা পূর্ণ এই বিশ্বাস দিয়ে। বিশ্বাসের দাপটে মাথার মধ্যে ঘিলু সংকীর্ণ অন্তেবাসী। আর বিশ্বাসের সাম্রাজ্য ক্রমবর্দ্ধমান—তার মধ্যে হাঁচি টিকটিকিরও প্রশস্ত স্থান আছে।

রবিবারের কাগজে তাঁর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ 'এ সপ্তাহ কেমন যাবে,' অর্থাৎ রাশিফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। শুধু এই জন্যই নগদ দশটি পয়সা খরচা ক'রে আশুবাবু রবিবারে 'নতুন বাংলা' পত্রিকাটি কেনেন, এবং কপালে ঠেকিয়ে পড়তে বসেন। 'এ সপ্তাহ কেমন যাবে' ছাড়া আর কিই বা পড়বার আছে সারা 'নতুন বাংলা'য়। একটু ঠাকুর-দেবতার নাম পর্যন্ত নেই।

সামনে গৃহিণী এসে বসলেন। বললেন, 'কি গো, অমন একলা পড়ছ কেন ? জোরে জোরে পড়, হপ্তার ফলটা পড় না শুনি।'

'অ। এই হ'ল গিয়ে মেষ রাশি।' আশুবাবু নিজের রাশির সাপ্তাহিক ভবিষ্যৎ উচ্চকণ্ঠে পড়তে আরম্ভ করলেন, 'লিখছে, বুঝলে গিন্নী, আর্থিক অবস্থা—এই সেরেছে'—

'কি হ'ল ?' উৎকণ্ঠিত গৃহিণী।

'খারাপ—আর্থিক অবস্থা।'

মিইয়ে গেল আশুবাবুর গলা। পরমুহূর্তেই আফশোষ করে উঠলেন, 'ননীকে চেপে ধরে, গেল বুধবারে ওর কাছ থেকে কথা আদায় করেছিলাম যে এ হপ্তায় টাকাটা দেবে। তা বোধ হয় দিলে না। এই শালার ননীকে নিয়ে পড়েছি মহা ঝামেলায়। টাকা নেওয়ার বেলায় কেঁচো—পা জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি। তারপরে দেওয়ার কথা সব বেমালুম হজম করে ফ্যালে। কৃতঘ্ন। সাধে কি আর কলি বলেছে! উপকারীর বুকে ছুরি মারাই এই কালের লক্ষণ, বুঝলে গিন্নী।'

'হায়, হায়, এ হপ্তায়ও টাকাকড়ির অবস্থা খারাপ।' শোক উথলে উঠল গিন্নার। 'ননীটা এবার এলে দূর করে তাড়িয়ে দেবে।' বীরশোক ক্রোধে রূপান্তরিত হল।

'যাকগে, দেখি, তারপর, কি লিখেছে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—'

'কি হ'ল ?'

'লিখেছে—সপ্তাহের শেষে আর্থিক অবস্থা একটু ভাল হতে পারে।'

'জয় বাবা সিদ্ধিদাতা। তোমার ননী তাহলে ঐ শেষ সপ্তাহেই টাকাটা দেবে, বুঝলে।'

'হুঁ।'

'তারপরে ?'

'এই রে।' আবার আর্ত্তনাদ করে উঠলেন আশুবাবু।

'কি হল ?'

'শত্রুতা বৃদ্ধি। এ নিশ্চয়ই বৃন্দাবনের কাজ—ও শালা নিশ্চয়ই

সাহেবের কাছে গিয়ে আমার নামে লাগাবে। এ শালার সঙ্গে মিত্রতা করি কি ক'রে! সাহেবের কাছে চুকলি খেলে শত্রুতাবৃদ্ধি তো হবেই। কি যে করি।'

'তুমি একটু বৃন্দাবন মুখপোড়ার নামে সাহেবের কাছে লাগাতে পারো না?'

'লাগাই তো। ওর মত অত মিথ্যে-মিথ্যে ফন্দি যে আমার মাথায় আসে না। আর ও খুব সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে পারে।'

'সেটা তুমিও একটু শেখো। বয়স তো কম হ'ল না। একটু না হয় বই-টই পড়।'

'এ হপ্তাটা সাবধানে চলতে হবে। ব্যাটা সাপের মত কোথা থেকে কখন কি ছোবল মেরে বসে কে জানে। বরং ও সাহেবের কাছে কিছু বলবার আগেই আমি ওর নামে লাগিয়ে আসব, কি বল?'

'তাই করতেই তো বললুম। তারপর কি লিখেছে?'

'লিখেছে—ওরে বাবা কোথায় যাইরে—।' আঁতকে উঠে প্রায় অজ্ঞান হবার যোগাড় আশুবাবু।

'কি হ'ল? ওরে ভজহরি, ভজহরি। চাকরটা যে যায় কোথায়!'

ভজহরি আসতেই গিন্নী খেঁকিয়ে উঠলেন, 'কোথায় যাস? ডেকে ডেকে গলা ফেটে গেল। তোকে না বলেছি জল আর পাখা নিয়ে হাজির থাকবি যখন আমরা খবর-কাগজ পড়ব।'

ভজহরি জল আর পাখা নিয়েই এসেছিল। বসে গেল আশুবাবুর পরিচর্যায়।

আশুবাবু একটু সুস্থ হ'লে গিন্নী বললেন, 'কি হ'ল? কি লিখেছে?'

'দুর্ঘটনায় জীবনশংকা দেখা দিতে পারে।'

'দিতে পারে—এখনই তো দিয়েছিল। কি হবে রে বাবা!'

'ট্রামে বাদুর-ঝোলার সময়ই নিশ্চয়ই অ্যাক্সিডেন্ট হবে।'

'তুমি আর অলুক্ষুণে কথাগুলো বোলো না। আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে, মাথা দপ দপ করছে।'

'ভজহরি, শীগগির ওকে হাওয়া কর। আমায় আর হাওয়া করতে হবে না। আমি এখন বেশ সামলে উঠেছি। যায় যাবে প্রাণ কি আর করা। জন্মেছি যখন মরতে তো হবেই।'
গিন্নী হাওয়া খেয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে ফতোয়া জারি করলেন, 'এ হপ্তায় তুমি একদম বেরোবে না। এক হপ্তা ছুটি নাও। জয় মা চণ্ডী। পাঁচ সিকি মানত করছি, মা। ওঁকে ভালয় ভালয় ফিরিয়ে দাও মা।'
'জয় মা চণ্ডী।' কপালে হাত ঠেকালেন আশুবাবু।
'জয় মা, জয়—'
'ওগো, এ যে তোমারও ইয়ে—' কাঁদকাঁদ সুরে বললেন আশুবাবু।
'কি আমার? কি লিখেছে?'
'স্ত্রীর শরীর ভাল নয়। তার মানে তোমার বাতের ব্যথাটা আবার বাড়বে।'
'আবার বাত! ওগো আমার কি হবে গো!'
'অত উতলা হোয়ো না গো। আমি এখুনি যাচ্ছি ডাক্তারের কাছে। ভগবানকে ডাকো। ভগবানের ইচ্ছেয় সব ঠিক হয়ে যাবে।'
'জয় মা চণ্ডী।'
'নাঃ, আর বাঁচতে দিলে না।'
'কেন? আবার কি লিখল?'
'পুত্রের শরীর খারাপ। খোকার টনসিলটা তার মানে আবার বাড়বে।'
'এবার ডাক্তার ডেকে ওটা কাটিয়ে ফেলব—ল্যাঠা চুকে যাবে।'
'জ্বরটরও হতে পারে।' হাঁক দিলেন গিন্নী, 'খোকা—'
খোকা এলো। গিন্নী কপাল ও বুকে হাত দিয়ে তার দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করলেন।
আশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'গলা ব্যথা করছে নাকি, খোকা।'
'না, বাবা।'
'ঢোঁক গিললেও নয়।'
'না।'
'আচ্ছা যাও। খেলা করো গে যাও।'

'আচ্ছা, তুমি কি বলতো।' চটে উঠলেন গিন্নী।
'কেন কি আবার হ'লো?
'ওর দেখছো শরীর খারাপ হবে। তুমি ওকে পাঠাচ্ছ রোদে ছুটোছুটি করতে। খোকা যাও ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক। আমি এসে গা-য় থারমেটার দিয়ে ভাল করে দেখব।'
ব্যাজার মুখে খোকা শুতে গেল।
'হ্যাঁ, সেই ভাল।' বললেন আশুবাবু। 'ওগো, ছ্যাখো, কি লিখেছে। অনেক টাকা পাবো—আকস্মিক—'
'অ্যাঁ, টাকা। পড় তো শুনি।'
'সাধারণভাবে আর্থিক অবস্থা খারাপ সত্ত্বেও আকস্মিক অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ দেখা যায়। ওগো লটারীর রিসিটটা ভাল করে রেখেছ তো?'
'হ্যাঁ।' ছুটে গিয়ে ঘর থেকে রিসিটটা নিয়ে এলেন গিন্নী।
'যাও, যত্ন করে রেখে দাও, নইলে হারিয়ে যাবে। জয় মা চণ্ডী।'
রিসিট্‌টা সিন্দুকে তুলে রেখে এসে গিন্নী জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে?'
'এই হপ্তাতেই তো লিখেছে। অ্যায় রে খেয়েছে।'
'কি হ'ল।'
'স্ত্রীর সহিত মনান্তর ও বিবাদ। ছ্যাখো তো এখন কি ঝামেলা! তোমার জন্যে তো লাগে ঝগড়া—'
'আমার জন্যে? সেদিন তুমি না আমার বাপের বাড়ী তুলে প্রথম খোঁটা দিলে—'
'শ্বশুর বাড়ী নিয়ে একটু ঠাট্টাও করতে পারব না? তুমি অমনি তাই ব'লে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসবে? ছিঃ!'
'ছিঃ ছিঃ কোরোনা বলছি।' ধমকে উঠলেন গিন্নী।
'ইস্‌ ধমকানো হচ্ছে। কেন, কি করবে কি? শ্বশুর বাড়ীই তো, গুরুঠাকুরের বাড়ী তো নয়।'
'খবরদার, টিটকিরি দিও না আমার বাপের বাড়ী নিয়ে। সেখানে তোমার অনেক গুরুজন আছেন।'

'হুঁঃ, গুরুজন !'

ইতিমধ্যে বাড়ীতে এসে ঢুকল ননী। নইলে রাশিফলের ভবিষ্যদ্বাণী তখননি চূড়ান্ত মাত্রায় ফলে যেতো হয়তো।

ননী বলল, 'আশুদা, এই যে তোমার টাকাটা। একটু দেরী হ'য়ে গেলো, কিছু মনে কোরো না।'

'না, না, মনে করব কি হে? তুমি কি আমার পর? বোসো বোসো। হাতে ওখানা কি কাগজ? 'নতুন বাংলা' বুঝি? 'নতুন বাংলা'-ই পড়ছিলুম এতক্ষণ।'

'না, আমারটা নতুন বাংলা নয়। এটা 'স্বদেশ প্রেম'—ভাল কাগজ।'

'দেখি, ওরা সাপ্তাহিক রাশিফল লেখে?'

'হ্যাঁ। এই তো, ছাখো না। তোমার কি রাশি?'

'মেষ।'

'এই তো মেষ, ছাখো না।'

'ও গিন্নী, এ যে ইয়ে—অ্যাঁ—।'

'কি লিখেছে? খারাপ কিছু?'

'না খারাপ নয়, মানে ইয়ে—ঢোক গিলে বললেন, লিখেছে, ইয়ে—'

'আঃ ইয়ে ইয়ে কোরো না তো।' ধমক দিলেন গিন্নী। 'কি লিখেছে পড়।'

'লিখেছে'—ধমকের চোটে গড়-গড় করে পড়ে গেলেন আশুবাবু। 'আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভাল, তবে বিপুল কোন ধনাগমের আশা নেই। স্ত্রী-পুত্রের শরীর বেশ ভালই যাবে। মিত্রলাভের যোগ দেখা যায়—পুরোনো শত্রুও শত্রুতা ত্যাগ করবে। কোনরূপ ফাঁড়া ইত্যাদির আশংকা নেই। কর্ম্মক্ষেত্র শুভ। মোটের ওপর সপ্তাহটি ভালই।'

কর্ত্তা-গিন্নী পরস্পরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু যাদের মগজে বিশ্বাস গজগজ করছে—বলতে গেলে বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নেই—তারা বেশীক্ষণ বিমূঢ় থাকতে পারে না। গিন্নী বললেন, 'কোনটা ঠিক? নতুন বাংলা না স্বদেশপ্রেম?'

মুহূর্ত্ত মাত্র ভেবে কর্ত্তা ডান হাতের দু'টো আঙ্গুল—তর্জনী ও মধ্যমা—গিন্নীর নাকের সামনে দোলাতে লাগলেন ঃ 'ধর একটা।'
গিন্নী তর্জ্জনী ধরতেই আশুবাবু বললেন, 'নতুন বাংলাই ঠিক। যাই তাহলে ডাক্তারকে একটা খবর দিই গে।'
ননী ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তার কেন?'
'তোমার বৌদির জন্যে।'
'কেন বৌদির কি হয়েছে?'
'হয়নি। হবে। হাজার হোক, আমরা বিজ্ঞানেরযুগের মানুষ তো। আগে থাকতেই সাবধান হওয়া ভাল। প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান্ কিওর, জানো তো।'
ননী বলল, 'আরে আশুদা, এই দ্যাখো তোমার নতুন বাংলাতেই লিখেছে মীন রাশির শরীর ভাল যাবে। বৌদির তো মীন রাশি।'
আশুবাবু মুহূর্ত্তের জন্যে থমকে গেলেন। কিন্তু অত্যন্ত শক্ত ভিতের ওপর গড়া তাঁর বিশ্বাসের প্রাসাদ। এত সহজে চিড় খাবার নয়। দ্রুত হাতটা নাড়িয়ে আশুবাবু ননীর নাকের সামনে দুটো আঙ্গুল বাড়িয়ে দিলেন—তর্জনী ও মধ্যমা।
'ধর, ধর শীগগির। নইলে ডাক্তার আবার বেরিয়ে যাবে।'
ননী বোধ হয় ভুল করেই চেপে ধরল তৃতীয় একটা আঙ্গুল—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।

'হরি হরি বল খুড়ীমা, বল, গৌর বল'—কাঁদ-কাদ সুরে কার্তিক বলে।

খুড়ীমা তখন ডাঙায়-তোলা ভেটকি মাছের মত খাবি খাচ্ছেন। কান দিয়ে হরিনাম ঢুকলো কিনা ঠিক বোঝা গেল না। হয়তো ঢুকলো, কিন্তু মুখ দিয়ে বেরুল না।

'দাও, মুখে গঙ্গাজল দাও, ঐতেই হবে; আহা, মা গঙ্গার থেকে পবিত্র কি আছে—হরিনামের চেয়েও পবিত্র।' সমবেত একজন হিতৈষী উপদেশ দেন।

কার্তিক উপদেশ পালন করে। ততক্ষণে পড়শীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে হিতৈষীপনা দেখাবার জন্যে। কোথাকার কোন বাঁড়ুজ্যের পো শুধু দুটো কথা বলে আমাদের ওপর টেক্কা দিয়ে যাবে! আমরাই বা কম কিসে! চাটুজ্যে-মুখুজ্যে-ঘোষ-বোসের দল এক পশলা উপদেশ বৃষ্টি করে মনে একটু স্বস্তি পান।

'একবার ডাক্তার দেখালে হয় না, মুখুজ্যে?'

'না, না, ডাক্তারের কি দরকার! কিছু হয়নি। বুড়ো মানুষ, তাই অমনি একটু মানে—ওকে কি বলে জান, হিক্কে। তবে এ ঠিক মরণকালের হিক্কে নয়, বুঝলে কিনা'—মুখুজ্যের আরও কিছু বলার ছিল।

বাধা দিলেন বসুপুত্র, 'কি যে বল মুখুজ্যে। এ হিক্কে দেখলেই চেনা যায় নেহাৎ মরণ কাছে না এলে অমন ধরণের'—কথাটা বোধ হয় ঠিক শোভন হচ্ছে না ভেবে প্রসঙ্গান্তরে গেলেন, 'আমার শালার এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে পাকা দুটি বছর কাটিয়েছি এক মেসে এক ঘরে, আমি বুঝব না কোন রুগীর কি হল!'

মুখুজ্যে চুপ করে গেলেন। তিনি কোন দিন কোন ডাক্তারের সঙ্গে এক-মেসে এক-ঘরে দু'বছর কাটাননি। সুতরাং ডাক্তারি শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা স্বাভাবিক।

বোস সবার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে কার্তিককে বলেন, 'ছাখো কার্তিক, আমি বলি কি, তোমার খুড়ীমাকে গঙ্গাঘাটে নিয়ে চল। সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা, আহা এর মত পুণ্য আর নেই, সজ্ঞানে মা গঙ্গার কোল পাওয়া ভাগ্যের কথা, পরলোকে বৈকুণ্ঠলাভ নির্ঘাৎ।'

এতক্ষণে ঘোষ মুখ খোলেন, রায় দেবার ভঙ্গীতে বলেন, 'হ্যাঁ, এইটাই ভাল কথা, কার্তিক, তুমি তবে ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা কর, এক্ষুনি নিয়ে যাওয়া দরকার।'

বাঁড়ুজ্যে প্রায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। এবার হাওয়া বুঝে গা ভাসালেন। 'হ্যাঁ সেই ভাল।'

চাটুজ্যে চোখ কুঁচকে তাকালেন বাঁড়ুজ্যের দিকে। অর্থাৎ তোমার আবার ফোড়ন দেওয়া কেন বাপু!

'কি বল কার্তিক?' জিজ্ঞেস করলেন বোস।

'আজ্ঞে আমি আর কি বলব। আমি কিই বা জানি, কি বা বুঝি। আপনারা পাঁচজনে যখন বলছেন তখন আমি আর—' বলে কার্তিক।

'আহা-হা কেঁদো না, কেঁদো না, কাঁদবে কেন, ছিঃ, যাও সব ব্যবস্থা করে ফেল টপ-টপ। সজ্ঞানে মা গঙ্গার পর্শ পাওয়া চাই তো? বুড়ো মানুষ, হয়তো এই আছেন, এই নেই।' বোস চুপ করেন।

কিছুক্ষণ কাটল সব ব্যবস্থা করতে। মেয়েদের কান্নার রোল উঠেছে। কার্তিকও কয়েকবার চোখ মুছে নিয়েছে।

ঘর থেকে বার করবার সময় খুড়ীমা যেন কি বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। শুধু তাঁর চোখ দুটো বড় হ'য়ে একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল। পরহিতৈষীর দল খেয়াল করল না। তারা তখন কাঁধ-ভাড়া দিতে উৎসুক—শ্রাদ্ধের ভোজটা পাওয়া যাবে তো।

গঙ্গা বেশী দূরে নয়। ঘাটে এসে খাট নামানো হল। বোস বললেন, 'বসলে হবে না, যাও ধরাধরি করে একদম জলের কাছে নিয়ে যেতে হবে, সজ্ঞানে মা গঙ্গার পর্শ পাওয়া চাই তো—'

গঙ্গা জলের বোধ হয় সঞ্জীবনী শক্তি আছে—'পর্শ' পেয়ে খুড়ীমা আবার চোখ খুললেন, বেশ বড় করে তাকালেন হিতৈষীদের দিকে।

খুড়ীমা সজ্ঞানে মা গঙ্গার স্পর্শ প্রাপ্ত হলেন, কিন্তু পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হলেন না।

মহা ফ্যাসাদ, কাঁহাতক এমনি করে ধরে রাখা যায়। কিন্তু বুড়ীর শীগ্‌গির মরবার কোন লক্ষণ নেই। বরং খাবি খাওয়াটা এখন একটু কমেছে। বোস মুখটা কাঁচুমাঁচু করে—গঙ্গাযাত্রার মূলে সে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, 'ডাঙায়-তোলা ভেট্‌কি মাছের খাবি খাওয়া শেষ হলে তার যে দশা হয়, বুড়ীর সেই দশাটা একটু তাড়াতাড়ি এনে দাও, হে ভগবান।' কিন্তু মাঝে মাঝে চোখ মেলছে যে! নিশ্বাস-প্রশ্বাসও খানিকটা সহজ হয়ে এসেছে মনে হচ্ছে।

মুখুজ্যে কটমট করে তাকায় বোসের দিকে—তার গঙ্গাযাত্রা করাবার ইচ্ছে ছিল না। কার্তিকও যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে—আহা অনর্থক এই ভদ্রলোকদের ভোগানোর কোনো মানে হয়!

শেষটা বুড়ীকে তুলে এনে ঘাটের একপাশে রাখা হল—একেবারে অন্তিম সময়ে মা গঙ্গার কোল পেলেই চলবে।

হিতৈষীর দল ঘাটের আর এক পাশে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

'ওহে কার্তিক, তোমার খুড়ীমার কাছে গিয়ে বসবার আগে একটু তামাকের ব্যবস্থা কর'—ঘোষ কথা বলেন কম। প্রয়োজন ছাড়া বলেন না।

'হ্যাঁ, হাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়—' কার্তিক কৃতার্থ না শংকিত ঠিক বোঝা যায় না—ট্যাঁকের অবস্থা খুড়ীমার অবস্থার চেয়েও খারাপ।

'নিদেন পক্ষে দু' বাণ্ডিল বিড়ি'—বললেন বাঁড়ুজ্যে।

চাটুজ্যে চোখ কুঁচকে তাকালেন বাঁড়ুজ্জের দিকে, অর্থাৎ তুমি আবার ফোঁপরদালালি করছ কেন!

কার্তিক ট্যাঁক ঝেড়ে দু' বাণ্ডিল বিড়ি কিনে দিয়ে গেল।

ধোঁয়ার গন্ধে ও স্বাদে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে সবাই। মুখুজ্যে বলেন, 'হাঁ হে বোসমশাই, দেখলে, বলেছিলুম এ মরণ-হিক্কে নয়। এখন দেখলে তো! হাজার হোক্ তোমার চেয়ে আমি পাক্কা তিন মাসের বড়, তোমার মা বেঁচে থাকলে তাঁর কাছে শুনতে পারতে।'

'আমি বলেছিলুম ওখানেই মুখে গঙ্গাজল দিলে হ'ত। আহা গঙ্গা জলের মত পবিত্র'—চাটুজ্যের সদ্য কুঁচকে ওঠা চোখের দিকে তাকিয়ে বাঁড়ুজ্যে থেমে যান।
বোস কি বলবেন খুঁজে পাচ্ছিলেন না, বাঁচালেন চাটুজ্যে: 'আমি তখন ডাক্তার ডাকতে বলেছিলুম, তা কেউ শুনলে না, গরীবের কথা বাসি হলে ফলে, এখন বোঝ।'
অন্য প্রসঙ্গে পৌঁছে বোস হাঁপ ছাড়লেন: 'তা দেখ চাটুজ্যে, এখনও একবার ডাক্তার দেখানো যেতে পারে। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণআশ, আমার শালার সেই ডাক্তার-বন্ধু বলত যে রুগীর শেষ নিশ্বেস পর্যন্ত একজন ডাক্তার বসিয়ে রাখা উচিত!'
কার্তিককে বলা হয় কথাটা। সে আমতা আমতা করে—পয়সা নেই বলতে বাধে। অথচ খুড়ীমার শেষ সময়ে সেবা-শুশ্রূষার একটু ত্রুটি হলে সারাজীবনে সে কলংক মুছবে না—পাঁচজনের মুখে ডাল-পালা গজিয়ে বিরাট আকার নেবে।
কার্তিক এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে ডাক্তার ডাকে—সেই ঘাটেতেই। ডাক্তার আসতে বুড়ী যেন একটু ভাল হয়ে উঠল। হিতৈষীব দল আরো কয়েক বাণ্ডিল বিড়ি ও কার্তিকের পকেট নিঃশেষ কবে স্নান-সমাপনান্তে ঘরে ফিরে গেল। শ্রাদ্ধের ভোজটা পিছিয়ে যাচ্ছে বলে অনেকে একটু হতাশ হলেন। অবশ্য মুখে কিছু বললেন না, সেইটুকু সৌজন্যবোধ তাঁদের ছিল!
এখন কি কর্তব্য, কার্তিক তা ভেবে ঠিক কবতে পাবলে না। হিতৈষীর দল তো খুড়ীমাকে ঘাটে শুইয়ে আর তাকে পথে বসিয়ে তাদের কর্তব্য শেষ করে চলে গেল। বুদ্ধিব ভাঁড়ার বৌ-র কথা একবার মনে পড়ল। ভাঁড়ারটা একবার হাতড়ে এলে হয়—যদি কিছু মেলে, ভারী পয়মন্ত ভাঁড়ার—কখনও নিঃশেষ হয় না। এক বন্ধুকে খুড়ীমার কাছে বসিয়ে সে গেল বাড়িতে।
বৌ শুনে বললে, 'হ্যাঁগা, তা এখন কি হবে গা! বুড়ী মরেনি, তবে

এতক্ষণ কাঁদলুম মিছিমিছি, এতখানি চোখের জল ফ্যালনা গেল গো। চেঁচিয়ে আমার গলা চিরে যাবার দশা—'

'চুপ—চুপ—চুপ! আঃ, কে কোত্থেকে শুনে ফেলবে।'

বৌ-র বুদ্ধির ভাঁড়ার সত্যিই অফুরান—লক্ষ্মীর ভাঁড়ারের মত। প্রচুর অশ্রু-ব্যয় ও চিরে-যাওয়া গলার শোকটা সামলে নিয়ে বললে, 'তা তুমি এক কাজ কর, বাঁড়ুজ্যের কাছে যাও, ওকে কিছু টাকা দিলেই একটা প্রাচিত্তির কি কিয়াকম্ম করে দেবে। তাহলেই ঘরে নিয়ে আসতে পারবে। ঘরে থাকলে খরচা কম—ডাক্তার-ওষুধের হাঙ্গামাও নেই। বাইরে পাঁচজনের সামনে থাকা-খাওয়া, ডাক্তার-ওষুধ—সে অনেক খরচা। তারপরে ধরগে শীত পড়ছে, একটা যা হোক চালা তুলতে হলেই কম-সে-কম—'

'রাত্তির হয়ে গেছে যে, এখন বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের বাড়ি যাব!'

'আজ না হয় থাক, কাল যেও বরং।'

পরের দিন বাঁড়ুজ্যের বাড়ি আর যেতে হল না। বাঁড়ুজ্যে স্বয়ং এসে ঘাটে উপস্থিত: 'কি হে, তোমার খুড়ীমা কেমন আছেন কাত্তিক?'

কার্তিক বিষম খেয়ে উত্তর দিলে, 'অ্যাঁ—আজ্ঞে ভালই।'

'বেশ, বেশ, ভাল কথা, তবে হ্যাঁ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভাল করে চিকিৎসে করানোই ভাল।···কত আর খরচ—ব্রাহ্মণ-ভোজন, গ্রহশান্তি, পূজো-আচ্চা এই সব আরো আনুষঙ্গিক দু'একটা ক্রিয়াকর্ম, তা ধর গিয়ে,—' বাঁড়ুজ্যে দরদামের ফাঁক রেখে একটু চড়া হাঁক দিলেন, 'হ্যাঁ, তা চারশোর মত লাগবে।'

কার্তিক আঁতকে উঠল: 'চা-আ-র্‌শো ও'—

বাঁড়ুজ্যে ঢোক গিলে বললেন, 'তা আমি না হয় কমই নেব আমার প্রাপ্যটা, সাড়ে তিনশ—'

'কি হে বাঁড়ুজ্যে এত ভোরে কি মনে করে?' চাটুজ্যে এলেন।

'কার্তিকের খুড়ীমা কেমন আছে দেখতে এলুম। আমি এখন তাহলে চলি, কার্তিক বুঝলে।' বাঁড়ুজ্যে বিদায় নেন।

চাটুজ্যে চোখ কুঁচকে তার যাওয়ার পথটার দিকে তাকিয়ে থাকেন: 'হ্যাঁ, হে কার্তিক, এই ভোরে বাঁড়ুজ্যে কি করতে এসেছিল হে!'

কার্তিক সত্যি কথাই বললে।

চাটুজ্যে চোখ কুঁচকে সব শুনলেন, বললেন, 'দেখো কার্তিক, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, ও শালা বাঁড়ুজ্যের কাছে তুমি যেও না, ও ব্যাটা এক নম্বরের ডাকাত, গলায় ছুরি মেরে টাকা আদায় করে—তা হ্যাঁ, মোট খরচ-খরচা বাবদ কত চেয়েছে?'

কার্তিকের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল: 'আজ্ঞে, চেয়েছে তো তিনশো—'

'ঐ দেখো বলেছি না শালা ডাকাত।' হঠাৎ কানের কাছে মুখটা এনে ফিসফিস করে বললেন, তার চেয়ে আমি বরং তোমায় আড়াইশোর মধ্যে করিয়ে দোব। রাজি? অ্যাঁ? কি বল?'

'আজ্ঞে একটু ভেবে দেখি—অত টাকাই বা কোথায় পাই!'

'আচ্ছা আচ্ছা সে হবে'খন, তুমি ভেবো না, আমি না হয় আর দু'চার টাকা কমই নোব—'

দুপুরের দিকে এলেন মুখুজ্যে। তিনি দুশোতেই রাজি। এ গাঁয়ে যে মুখুজ্যেই কার্তিকের সবচেয়ে বড় হিতৈষী, এ কথা তো আর নতুন করে বলবার কিছুই নেই—আর সেই জন্যেই তিনি নিজের ক্ষতি করেও এ কাজটা করে দেবেন।

ঘোষ বোসের দল একগাছা পৈতের অভাবে কাছে ঘেঁসতে পারলেন না। ক্রোধ আর দীর্ঘনিশ্বাস দুটোই চেপে নিয়ে বললেন, 'ভারী তো একগাছা দড়ি, তার আবার দর্প কত! হুঁঃ, এই যে সেদিন কার্তিকের খুড়োকে গঙ্গায় নিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের ছুঁতে দিলে না, তাতে সে বুড়োর কোন স্বর্গলাভটা হল!'

কিন্তু তাঁদের পরোপচিকীর্ষা প্রবল, উপকার করাই চাই—দরকার থাক আর না থাক। বোস গিয়ে বললেন, 'শোন কার্তিক, ও সব ক্রিয়াকর্ম শান্তি-স্বস্ত্যয়নে টাকা খরচ করে লাভ নেই, মিছিমিছি টাকা খরচ করবে

কেন? তার চেয়ে যা হোক একটা চালা তুলে দাও ঘাটের ওপাশে, কদিনই বা—'

ঘোষ বুঝলেন এখন সায় দেওয়া প্রয়োজন: 'হ্যাঁ সেই ভাল, বুঝলে কার্তিক—'

কার্তিক বুঝল, একটা 'যা-হোক' চালা তোলা হল। সত্যি খরচা কম। অবশ্য তবু কার্তিকের ধার করতে হল।

চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে-মুখুজ্যে চোখ কটমট করে ঘোষ-বোসের দিকে তাকালেন। ঘোষ-বোসেরা মুচকি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

কার্তিকের ধারের অংক বাড়তে থাকে।

বাড়িতে খুড়ীমা একটা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে শুতেন! কিন্তু গঙ্গাঘাটে পাঁচজনের সামনে সেটা থাকলে কার্তিকের লজ্জা করে। একটা কম্বল কেনা দরকার। তবু সে দু'একদিন দেরী করেছিল, সেই 'যা-হোক' চালাটা তোলার সময়। মনে আশা ছিল, বুড়ী যদি এর মধ্যে দয়া করে পটল তুলে ফেলে তবে খরচা কমবে। কিন্তু বুড়ীটা এমন বে-আক্কেলে, সে সব শুভকর্ম দূরে থাক দিনে দিনে যেন আরো তাজা হয়ে উঠল।

সত্যি বুড়ীর স্বাস্থ্য ভাল হয়ে উঠছে, অস্বীকার করা যায় না। কার্তিক এতদিন চোখে না হলেও, মনে মনে অস্বীকার করেই এসেছে; কিন্তু যেদিন ডাক্তার বললেন, 'ভাত দিন', সেদিন আর কার্তিক এই নিষ্ঠুর সত্যটিকে স্বীকার না করে পারলে না। ডাক্তার ভাত দিন বলেই খালাস। এখন ঘাটে ভাত দেয় কে? অন্ততঃ রান্নাবান্নার জন্যেও একজন লোক দরকার—লোকটিও বামুন হওয়া চাই।

বাঁড়ুজ্যে বললেন, 'তার জন্যে ভাবনা কি, আমার বিধবা শালীটা তো আমার এখানেই রয়েছে, বড় কাজের মেয়ে বুঝলে কার্তিক। তোমার কিচ্ছু ভাবতে হবে না। আমরা হলুম তোমার পাড়া-পড়শী, তোমার আপদে-বিপদে আমি দেখব, আমার কষ্টের সময় তুমি দেখবে, এ না হলে হয়!···তুমি খাওয়াটা দেবে আর দু'চার টাকা হাত-খরচ পার দিও, না পার না দিও।'

চাটুজ্যে এলেন একটু পরে। জানিয়ে গেলেন, তার একটা বিধবা ভাইঝি আছে—ভারী কাজের মেয়ে।

মুখুজ্যেও এলেন। তিনি যে কার্তিকের সবচেয়ে বড় হিতৈষী একথা কার্তিকের চেয়ে বেশি আর কে জানে! তাঁর একটি বিধবা বোন আছে এ খবর কি আর কার্তিক না জানে!

কার্তিক তার 'বুদ্ধির ভাঁড়ারে'র পরামর্শে চাটুজ্যের ভাইঝিকে বহাল করলে। আর দু'জন প্রার্থী—বাঁড়ুজ্যের শালী অধর মুখুজ্যের বোন—দু'জনেরই ঢের বয়স, গঙ্গাযাত্রার সময় হয়েছে, খুড়ীমার আগে যায় কি পরে যায় ঠিক নেই। 'বুড়ো গাই না দেয় বাচ্ছা না দেয় দুধ, শুধু গিলতে দড়।'

বাঁড়ুজ্যে-মুখুজ্যে অসন্তুষ্ট হলেন কার্তিকের ওপর, চাটুজ্যের ওপর।

ঘোষ-বোস এ যাত্রায় কারুর কোন উপকার করতে না পেরে ভারী মনঃকষ্ট পেলেন। পরের উপকার করতে করতে অভ্যাসটা এমন বেয়াড়া হয়ে' দাঁড়িয়েছে যে ও জিনিষটা না করতে পারলে মনে স্বস্তি পান না, রাতে অনিদ্রা হয়।

চাটুজ্যের ভাইঝি কার্তিকের চেয়ে বড়, সে একদিন কার্তিককে বললে, 'ছাখো, তোমার খুড়ীমার বড় ইচ্ছে একটু ফুলকপির ডালনা খান।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ তার জন্যে আর কি! এনে দোব কাল'—মুখে কথাটা বললে বটে কিন্তু মনে পড়ল ফুলকপির দামের কথা। এ অঞ্চলে ফুলকপির আমদানী কম, আর তাছাড়া শীতের সবে সুরু, আগুন-দর এখন।

চাটুজ্যের ভাইঝি বললে, 'আমিও তো তাই বলি, তুমি এখন বড় হয়েছ, যুগ্যি হয়েছ, তুমিই ওঁর ছেলের মত, ওঁর শেষ ইচ্ছাটা কি আর—'

কয়েকদিন পরে। খুড়ীমা এখন ক্ষীণকণ্ঠে ইঁদুরের মত চিঁ চিঁ করে কথাবার্তা বলেন। কার্তিক জিজ্ঞেস করলে, 'কি গো খুড়ীমা, সেদিন ফুলকপির ডালনা কেমন খেলে?'

'ভাল রে, বৌমা বুঝি রেঁধে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তা বৌমার এমন কঞ্জুস হাত, মোটে একখানা কপি দিয়েছে, জানে আমি কপি ভাল বাসি—'

'না গো, তোমার বৌমা রাঁধবে কেন! 'আমি যে একটা গোটা কপি চাটুজ্যের ভাইঝিকে দিয়ে গিয়েছিলুম—তুমি নাকি খেতে চেয়েছিলে।'

'কবে আবার খেতে চাইলুম, কি জ্বালা বাবা। তা হ্যাঁরে সে গোটা কপিটা তাহলে কি হল?'

'যাক্ যাক্ ও কথা যাক, তুমি কেমন আছ বল।'

খুড়ীমার শরীর খুব ভাল নয়, তবু কার্তিককে খুশি করতে বললেন, 'ভাল, বেশ ভালই আছি বাবা।'

খারাপ শুনলেই কার্তিক খুশি হ'ত।

খুড়ীমা তার চিঁ চিঁ স্বরটা আরও করুণ করে বললেন, 'দেখ বাবা, কদিন ধরেই সত্য-মুদির দোকানের সোনামুগ ডাল খাবার ইচ্ছে হয়েছে, বলি বলি করেও বলতে পারিনি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তার জন্যে ভাবনা কি।'

'আমিও তাই ভাবি বাবা, আমার শেষ ইচ্ছেটা কি আর তুই পূরণ করবি না

কয়েকদিন পরে।

খুড়ীমা একদিন বললেন, 'বাবা কার্তিক, কাল ভোর রাতে স্বপ্ন দেখলুম, আমি যেন শম্ভু ময়রার দোকানের রামচাকি সন্দেশ খাচ্ছি।'

এরকম স্বপ্ন তিনি মাঝেই দেখতে লাগলেন। শেষ ইচ্ছে সবগুলোই, পূরণ না করলে পরলোকে গতি হবে না। আর খুড়ীমা কদিনই বা আছেন! আজ আছেন, কাল নেই! তবে খুড়ীমা বিশেষ ভাবেন না—ছেলের যুগ্যি কার্তিক থাকতে তাঁর ভাবনা কি।

কার্তিক সেদিন তার দাওয়ায় বসে হুঁকো টানছিল। একটা ছোট মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে 'ওগো কার্তিকদা গো, তোমার খুড়ী মরে গিয়েছে, তোমায় শীগ্‌গির যেতে বললে—'

কার্তিক উল্লাসের আতিশয্যে এক লাফে ভেতর-বাড়ীতে চলে গেল। 'হাঁগো শুনছো, খুড়ী শিঙে ফুঁকেছে—'

'অ্যাঁ, তাই নাকি'—রান্নাঘর থেকে বৌ বেরিয়ে এল। 'আমি রোজ

ভগবানকে ডাকতুম আর ভাবতুম পোড়ারমুখো ভগবান বুঝি কানের মাথা খেয়ে বসে আছে। হে বাবা ভগবান, সবার সব পাৰ্থনা তোমার কানে যায় বাবা, হে বাবা দয়াল ঠাকুর—'

কার্তিক ঘাটে যাওয়ার সময় ভাবতে লাগল, কি ভাবে ও কত জোরে কাঁদলে কান্নাটা সঠিক ও শোভন হবে।

গিয়েই 'ওগো খুড়ীমা গো', বলে কার্তিক আছাড় খেয়ে পড়ল।

'আহা-হা কর কি, কর কি, তোমার খুড়ী এখন বেশ সামলে নিয়েছে, এখন বেশ ভালই আছে, কাঁদছ কেন!'

সত্যি কথা বলতে কি, এতক্ষণ কার্তিক কাঁদেনি, কিন্তু এখন তার সত্যি সত্যি কান্না পাচ্ছিল।

বাড়ী এসে বৌকে বললে, 'ওগো শুনছো, বুড়ী মরেনি।'

বৌ পা ছড়িয়ে কাঁদছিল, যেন আঁতকে উঠল: 'আঁা—কি জ্বালা! কতক্ষণ ধরে কাঁদছি—'

'তা আর কি করবে বল, কপালে না থাকলে আমরা আর কি করি' কার্তিক সান্ত্বনার সুরে বলে, 'ভগবানকে ডাক, ভগবানকে ডাক।'

বৌ বোধ হয় ভগবানকে ডেকেছিল, এবং ভগবানের দেহে বোধ হয় দুটি সুস্থ কান আছে। তাই দিন তিনেক পরে আবার খাবি খেতে সুরু করলেন খুড়ীমা।

চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে-মুখুজ্যের দল ধরাধরি করে খুড়ীমার দেহ গঙ্গার জলের কাছে নিয়ে এলেন—সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করাবার জন্যে। কার্তিক সামনেটায় বসে কাঁদতে লাগল। কতক্ষণ কেঁদেছিল ঠিক ঠাওর নেই। হঠাৎ তার সম্বিৎ ফিরে এল বাঁড়ুজ্যের কথা শুনে: 'না হে অনেক দেরী আছে, যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে, এখন তুলে নিয়ে চল, পরে না হয় দরকার হলে আনা যাবে।'

তারা ধরাধরি করে খুড়ীমাকে সেই 'যা-হোক' চালাটার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল; কার্তিকের মনে হল, এর চেয়ে নিদারুণ শোকযাত্রা সে আর দেখেনি।

বাড়ীতে এসে বললে, 'হুঁ, খুড়ীর গঙ্গাযাত্রা, না শালা আমার গঙ্গাযাত্রা, ধারে ধারে তো তলিয়ে যাচ্ছি—'

বৌ বিস্মিত ও ভীত হয়ে বললে, 'অ্যাঁ, মরেনি!'

'না, মর-মর হয়েছিল।'

'হ্যাঁরে মুখপোড়া ভগবান, নিত্যি নিত্যি এ তোর কেমন ধারা রঙ্গ রে! ঢং দেখে আর বাঁচিনে—'

ভগবান বোধ হয় ভয় পেয়ে গেলেন। কি জানি—কি করে বসে! সাক্ষাৎ সীতা-সাবিত্রীর জাত এই মেয়েরা। সেই সাবিত্রী—যিনি একদিন স্বয়ং যমরাজের ভেল্কি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সাক্ষাৎ শক্তি অংশে জন্ম এঁদের। কি জানি, হঠাৎ যদি সম্মার্জনীরূপ অস্ত্রই ধরে বসেন, তাহলে সুদর্শন চক্রেও নিস্তার পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে এই সব কড়া ভক্তদের দরখাস্ত মানে মানে মঞ্জুর করে দেওয়াই শ্রেয়।

খুড়ীমা পরদিন মারা গেলেন। বোঝা গেল, শক্তের ভক্ত সবাই—মায় ভগবান পর্যন্ত।

খুড়ীমা মারা গেলেন সত্যি, কিন্তু কার্তিক ভয়ে ভয়ে কাঁদতে পারলে না, কি জানি হঠাৎ যদি আবার ফস্ করে বেঁচে ওঠেন—সেই আগের দু'বারের মত!

চিতার আগুন যখন জ্বলল তখন কার্তিক হাঁউ মাউ করে উঠল, 'ওগো খুড়ীমা গো, তুমি কোথায় গেলে গো-ও-ও-ও?'

পড়শীরা সান্ত্বনা দিলে, 'আর কেঁদে কি করবে বল, সবই ভগবানের হাত।'

কাঁদতে কাঁদতেই কার্তিক জবাব দিলে, 'সবই তো বুঝি, তবু মন মানে কই ভাই, তোমরা তো জান, ছোটবেলা থেকে মা নেই, খুড়ীমাই আমার মা, ওগো খুড়ীমা গো-ও-ও—'

অতি আনন্দেও যে চোখে জল পড়ে এ সত্যটা আজ কার্তিক মনে-প্রাণে উপলব্ধি করল।

আর কার্তিকের বৌ-র কান্নার দাপটে সাত রাত গাঁয়ের লোক ঘুমুতে পারলে না। বৌ বুদ্ধির ভাঁড়ার, তাই দিনে কাঁদে না—দিনের বেলা

গোলমালে সবাই শুনতে পাবে না, ঠিক মাঝরাতে 'ওগো খুড়ীমা গো-ও ও' বলে আর্তনাদ করে ওঠে। তা শুনে ছোট ছেলে-মেয়ে মার কোল ঘেঁষে শোয়, আর তাদের মায়েরা বলে, 'হ্যাঁ, বৌটা শোক পেয়েছে বটে!'

পড়শীদের মধ্যে যারা শ্মশানে গিয়েছিল তারা বৌদের এ কথায় আপত্তি তোলে, 'শোক পেয়েছ বটে কার্তিক, শ্মশানে তার কান্নাটা যদি দেখতে।'

এই নিয়ে গাঁয়ে ডজনখানেক দাম্পত্য কলহ হয়ে গেল। চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যের বাড়ীতেও হ'য়েছিল। কিন্তু ওঁরা সেদিকে বেশী মন দিলেন না। তাড়াতাড়ি ছুটলেন কার্তিকের বাড়ীতে। কার্তিক বিপদগ্রস্ত, তার উপকার করতে হবে। গিয়ে দেখেন, মুখুজ্যে-ঘোষ-বোস পৌঁছে গেছে। ওদের বাড়িতে বোধহয় দাম্পত্য কলহ হয়নি। আরো একটা মারাত্মক খবর চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে পেলেন: এই মৃত্যুতে কার্তিক আর কার্তিকের বৌর চেয়ে যে মুখুজ্যের শোক কম হয়নি। একথাটা সে প্রমাণ করে ফেলেছে। অর্থাৎ মুখুজ্যে শ্রাদ্ধ করাবেন।

চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যের দেরীতে পৌঁছবার কারণ দাম্পত্য কলহ। দু'জনে দাঁও ফস্‌কে এ ওর দিকে তাকান। সমব্যথী দুজন হাত ধরাধরি করে যে যার বাড়ী ফেরেন।

সেদিন রাত্রে গাঁয়ের কেউ ঘুমোতে পারলে না। চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে তাদের বৌদের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করছে। ঝগড়ার বিষয়,—কার্তিকের শোক বেশী না কার্তিকের বৌর শোক বেশী।

সুনন্দা বলল, 'আর বলো না অমলদা। পারি না বাপু আর। বাড়ীতে এত গার্জেন জুটেছে, তার ঠেলায় অস্থির। বাবা, মা, কাকা, দাদা— উঃ সবাই সাংঘাতিক।'

অমল বিরসবদনে বলল, 'কিছু তো উপায় দেখতে পাচ্ছি না। সে যে তোমাদের বাড়ীর একেবারে খাস-মহলে। নইলে আমার তো ইচ্ছে করে রূপকথার রাজপুত্তুরের মত পক্ষীরাজ ঘোড়ায় করে—'

'উঃ অমলদা, অনেক দেরী হয়ে গেল। চল উঠে পড়ি।'

অমল বিরসতর বদনে বলল, 'চল।'

বাড়ী এসে সুনন্দা পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকছিল। মতলব ছিল কাপড় পালটে দিব্যি ঘরোয়া হয়ে মার সঙ্গে দেখা করবে। ভাবটা থাকবে এমন যে সে বাড়ীতে এসে দিব্যি পুরোনো হয়ে গেছে।

কিন্তু মানুষের জীবনে কটা আশাই বা সফল হয়! সুনন্দার এ আশাও সফল হল না! বারান্দায় মোড়টা ঘুরতেই মার সঙ্গে মুখোমুখি।

'এত দেরী কেন রে?'

'ঐ লাইব্রেরীতে একটু—' মিনমিন করে বলল সুনন্দা।

'কতদিন না তোকে বলেছি, অত পড়াশুনোর দরকার নেই। মেয়েছেলের কি হবে অত পড়াশুনো দিয়ে—'

'বাঃ, মেয়েরা বুঝি মুখ্যু হয়ে থাকবে?'

'তুমি মুখ্যু নও। যা হয়েছে, অনেক হয়েছে। তোমার বাপ-কাকার জন্যে শুধু—না হলে এতদিনে তোমায় আমি পার করে রেহাই পেতুম। শোনো, দিনরাত পড়ে পড়ে চোখে কালি ফেলে কোলকুঁজো হবার কোন দরকার নেই। মেয়েদের চেহারার দিকে নজরটা রাখতে হয়। এত বিকেল অবধি জলখাবার না খেয়ে শুধু বইয়ের অক্ষর গিললে দু'দিনে হাড়গিলে হয়ে উঠবে যে।'

'কে, কে হাড়গিলে হয়ে উঠল ?' ঢুকল সুনন্দার দাদা অনিল। পেশায় ডাক্তার। অতএব বাড়ীর স্বাস্থ্যের পূরো জিম্মা তার।

মা বললেন, 'এই সুনু।'

'কেন, সুনুর আবার কি হ'ল ?' ডাক্তার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। 'মাথা ধরেছে! একটা পাল্ভ্ এ, পি, সি খেয়ে নে।'

'না না, মাথা ধরা নয়।' বললেন মা।

'তবে ?'

'সময় মত খাওয়া নেই। শরীর খারাপ হবে না—?'

'ইরেগুলারিটি ? সুনু, জীবনে একটা কথা মনে রাখবি, ডু নট নেগলেক্ট ইওর হেল্থ্। জানিস সময় মত না খাওয়ার জন্যে গ্যাসট্রিক্ আলসার হ'তে পারে। নো, নো, দিস্ ওন্ট ডু। কেন, খেতে চাস না কেন ? বলতো ঠিক করে। ডাক্তারকে সব বলতে হয়। দেখি তোর জিভ। হুঁ, যা ভেবেছি তাই। মা, একটা টনিক খাওয়া দরকার। আচ্ছা লিখে দিচ্ছি! না, থাক আমি নিয়েই আসবখন! সুনু, যাও খেয়ে নাও। এাণ্ড রিমেম্বার, হেল্থ ইজ প্রেশাস্! নেভার নেভার ফরগেট দিস্। আচ্ছা আমি চলি।' ডাক্তার ও দাদা অনিল বেরিয়ে গেল ডাক্তারী-ব্যস্ততায়।

মা বললেন, 'শুনলি তো। যা, কাপড়-চোপড ছেড়ে ফ্যাল।'

জলখাবার পুরো দস্তুরই খেল সুনন্দা। কিন্তু মা তবু ছাড়তে চান না :

'ঐ পরটা-টা খেয়ে ফেলো। আজ এত বেলায় খাচ্ছ নিশ্চয়ই ক্ষিধে বেশী পেয়েছে।'

'খেয়েছি তো।'

'একটু বেশী করে খাও। চেহারাটা ভেঙ্গে গেল শেষে বিয়ে দিতে আমার হাড় কালি হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, বাপু, খাচ্ছি। অনুরোধে নিত্য ঢেঁকি গিলছি, আর একটা পরটা খেতে পারব না ?' বিরক্তিটা অপ্রকাশ রইল না সুনন্দার কণ্ঠে।

মা কিন্তু সে বিরক্তিটুকু গায়ে মাখলেন না। তিনি অতি-পরিতৃপ্তির সঙ্গে পরটা-চিবানো দেখতে লাগলেন, যেন জলাপাহাড় থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছেন, অথবা দুরন্ত উর্ব্বশীর স্বশ্রী গতিচ্ছন্দ। এক এক টুকরো পরটা সুনন্দার পেটে যাচ্ছে, আর এক টুকরো খুশী ভেসে উঠছে মার মুখে। সুনন্দা সেই খুশীর সুযোগটা নিয়ে আব্দারের সুরে বলল, 'মা, এখন একটু শ্যামলীদের বাড়ী যাব ? এই যাব আর আসব।'

'না বাপু। কি কাজ অত পাড়া বেড়িয়ে। এই তো এলে কত ঘুরে। দু'দণ্ড বাড়ীতে বোসো না। একটু জিরোন দাও।'

রান্নাঘরের ওপাশে চা তৈরী করছিলেন কাকীমা নিরুপমা। তিনি চিনি নাড়তে নাড়তে এতক্ষণে কথা বললেন, 'দিদি এই মেয়েটাকে একেবারে ঘরকুণো করে ফেললে। আজকালকার মেয়ে হবে বেশ স্মার্ট। সব জায়গায় চলবার কথা বলবার ক্ষমতা রাখবে। তা নয়, তুমি দিদি, ওকে একেবারে ঠুঁটো ক'রে ফেললে। সমাজে কি করে চলতে হয়, কি ভাবে দু'টো কথা বলতে হয়, তাই যদি না শিখল মেয়ে, তবে তার এ যুগে কি গতি হবে বলতো ? ওকেও নিজের মত আদ্যিকালের ক'রে গড়তে চাও।'

'থামো নিরু। মেয়ে এম, এ, পড়ে। এই এলো এতক্ষণ কলেজ আর লাইব্রেরী ঠেঙিয়ে। এতেও যদি তোমরা বল যে মেয়েকে ঠুঁটো করে রেখেছি আমি, তো বেশ ঠুঁটোই ভাল, আমার মেয়ের চার হাত পা গজাবে এ আমি চাই না।'

ভোটের অধিকার প্রাপ্তা সাবালিকা গ্রাজুয়েট কন্যা সুনন্দা চুপচাপ বসে রইল। মা আর কাকীমা তার ভাগ্য নির্দিষ্ট করবার চেষ্টায় বিতর্কে অগ্রসর হলেন। সুনন্দার কিছু বলার থাকতে পারে না সে বিতর্কে ! বললও না সে কিছু—মুখটা সুড়সুড় করলে সেটাকে উষ্ণ চায়ের স্বাদে নিরস্ত রাখল। আর বলবার তেমন কিছু নেইও। উভয় পক্ষের মত তার জানা।

বিতর্কটা যখন বেশ জমেছে, এমন সময় রসভঙ্গ করলেন সুনন্দার কাকা এসে। নরেন্দ্রনাথ অধ্যাপক—ধুতি পাঞ্জাবী চাদর ও ব্যাগে একটি অখণ্ড

প্রোফেসর। 'কই গো চা দেখি।' কলেজের চিৎকারে নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ চা-স্পৃহ। মা ও কাকীমার একান্ত বিতর্ক-স্পৃহা আপাতত স্থগিত রইল। 'কি গো, সুনু মা, পড়াশুনো কেমন চলছে? সব বুঝতে পারছো তো?' মেয়ের আগেই মা জবাব দিলেন, 'তুমি আর সুনুকে অমন পড়া-পড়া করো না ঠাকুরপো। তার চেয়ে বরং ওর জন্যে একটা ছেলে ছাখো। বিয়েই তো মেয়েদের শেষ গতি—যতই পড়াও।'

নরেন্দ্রনাথ চশমাটা নাকের ডগায় এনে হাঁ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন মাকে। সেই দৃষ্টির সামনে মা যেন একটু বিব্রত বোধ করলেন। নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'বৌদি তোমার এই সব ওল্ড আইডিয়া ছাড়তে হবে। তোমায় মনে রাখতে হবে যে তুমি মিডিভ্যাল যুগের মানুষ নও, তুমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ। বিয়েটা মেয়েদের মোক্ষ এ আইডিয়া ছাড়তে হবে। বিয়ে না হলেও নারী তার স্বকীয় মহিমায় ভাস্বর। মহামতি ষ্টুয়ার্ট মিলের কিছু লেখা তোমার পড়া উচিত, বৌদি। আমি কোথায় চেষ্টা করছি সুনুকে এম, এ,-তে ফার্স্ট ক্লাস পাইয়ে একটা ডি, ফিল পাওয়াব, আর তুমি কিনা—ধ্যেৎ।'

'ওমা, সে কি কথা! মেয়েছেলে বিয়ে করবে না?'

'করবে না, তাতো বলছি না। কিন্তু বিয়েটাকে ধ্যান-জ্ঞান জীবনের সব কিছু ভাবলে ভুল হবে। আর বৌদি, তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন। ঐ তো বয়স সুনুর। দু'দিন জগতকে দেখুক, পড়াশুনো করুক, জ্ঞান বাড়ুক, তারপরে করবে বিয়ে। বিয়ে তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।'

'ছাখ ভাই, আমারা সেকেলে মানুষ, মেয়ের বিয়ে—'

নরেন্দ্রনাথ মার কথা শোনা বাহুল্য মনে করে সুনন্দাকে বললেন, 'হ্যাঁ মা সুনু, সেদিন তোমার ফেনোমেনালিজমটা বোঝা হয়েছে? হয় নি? আচ্ছা, আজ সন্ধ্যায় তাহলে ওটাই হবে। বুঝলে, ফেনোমেনালিজমের জন্ম হ'ল গিয়ে—'

কাকামা বললেন, 'এই এল মেয়েটা লাইব্রেরী থেকে। এখুনি আবার তুমি ওকে নিয়ে পড়লে?'

নরেন্দ্রনাথ খুশী হলেন, 'এতক্ষণ লাইব্রেরীতে ছিলে মা সুনু! বেশ, বেশ। ভেরি গুড। আচ্ছা সন্ধ্যেয় আজ তাহলে—অ্যাঁ।'

নরেন্দ্রনাথ চা খেয়ে নিজের পুস্তকাকীর্ণ ঘরের খোলের মধ্যে শামুকের মত সেঁদিয়ে গেলেন।

ওপরের ঘর থেকে বাবা অর্থাৎ বীরেন্দ্রনাথ হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: 'সুনু ফেরে নি ?'

বীরেন্দ্রনাথ রিটায়ার করার পর বর্তমানে পরলোকের কড়ি সংগ্রহ করছেন অর্থাৎ ধর্মে মন দিয়েছেন। তাঁর ঘরে তেত্রিশ কোটির প্রতিনিধি-স্থানীয় দেবতাদের ছবি আছে (কে কবে ফটোগ্রাফ নিয়েছিল কে জানে)। পুণ্যভূমি ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটিকে তাড়াবার জন্য যে ক'টি অবতার কর্ণধার জন্ম গ্রহণ করেছেন, তাদের চেহারাও আছে এখানে। আর আছে ধর্মপুস্তক—নানা বয়সের, নানা আকারের, নানা মলাটের। বীরেন্দ্রনাথ বাইরে বড় একটা বার হন না। মনকে ভেতরে গুটিয়ে নিচ্ছেন; তার প্রথম পদক্ষেপ দেহকে গুটিয়ে নেওয়া। এই সন্ধ্যেবেলা মেয়েকে ডেকে একটু গল্পসল্প করেন। সুনন্দার ক্লাসের খুঁটিনাটি খবর জিজ্ঞেস করেন। আজও পড়াশুনোর কথাই উঠল। বীরেন্দ্রনাথ বললেন, 'যাই বল মা, তোমাদের এই ফিলসফি পড়ানোর ধরণটা আমার পছন্দ নয়।'

'কেন বাবা ?'

'এ একেবারে শুকনো ব্যাপার। এর সঙ্গে একটু একটু ধর্ম শিক্ষা দেওয়া উচিত। ধর্মবোধ ও আধ্যাত্মিক শক্তি জাগ্রত না হ'লে দর্শন পড়া বৃথা। এই কথাটা আজকের পণ্ডিতরা ভুলে গেছেন, এই আমাদের নরেনও তাই; মুখে খালি বুলি—সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ্। সায়েন্স মানুষের মনের সবটুকু তৃষ্ণা মেটাতে পারে মা? পারে না। তুমি মা একটু ধর্মগ্রন্থ পড়া সুরু কর। এটা বিশেষ দরকার। আনন্দও পাবে।'

'পড়ব বাবা।'

'তুমি তাহলে এই সুবৃহৎপরমধর্ম্মপুরাণ গ্রন্থখানি নিয়ে যাও। শুধু বুদ্ধি দিয়ে প'ড় না মা, তোমার বিশ্বাস দিয়ে পড়তে হবে এ গ্রন্থ।'

সুবৃহৎপরমধর্ম্মপুরাণ কাঁধে করে সুনন্দা এল নিজের ঘরে। একটু নিরিবিলি থাকবার জন্যে সুনন্দা একা একটা ঘরে থাকে। যাক এখন এখানে কেউ নেই। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সুবৃহৎপরমধর্ম্মপুরাণটা মাথায় বালিশের মত দিয়ে শুয়ে পড়ল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। চোখ বুজল সুনন্দা ক্লান্তিতে। ঘনতর হ'ল অন্ধকার। এতক্ষণে একটু জিরোবার সময় পাওয়া গেল। বেশ লাগছে।

কিন্তু বেশীক্ষণ এমন বেশ লাগতে দিলেন না মা। এসেই পুটুশ করে আলোটা জ্বাললেন। করকরে আলো টেনে খুললো সুনন্দার চোখের পাতা দুটো।

'একি এমন অসময়ে শুয়ে যে? শরীর খারাপ করেনি তো, সুনু?' তাড়াতাড়ি এসে কপালে হাতটা চেপে ধরলেন মা।

সুনন্দা উঠে পড়ে বলল, 'না, কিছু না। এমনি।'

'ছাখ সুনু, এই বেলা পড়তে বসে যা। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বি। তোদের এই রাত জেগে পড়া আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। চোখ ঢুকে যায় কোটরে, গায়ের রঙ হয়ে যায় কালি,, মেয়েদের আর মেয়ে বলেই চেনা যায় না। নে, এখুনি বোস্ পড়তে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বি।'

সুনন্দা টেবিলে এসে বসল। মা বেরিয়ে গেলেন।

এখন কী পড়া যায়—ভাবতে লাগল সুনন্দা। সুবৃহৎপরমধর্ম্মপুরাণ না ফেনোমেনালিজম্? দুইই তার কাছে সমান। পরমধর্ম্মপুরাণটি যত সুবৃহৎই হোক না কেন, সুনন্দার ঊষর হৃদয়ে এক বিন্দু ধর্ম্মবোধও সিঞ্চন করতে পারবে না। ফিলসফিতেও উৎসাহ তার ঐ একই প্রকার। কিন্তু তবু ফিলসফিরই ছাত্রী সে—আইনত কাগজে-কলমে। কাকার ইচ্ছে সে দর্শনের সমুদ্র এক গণ্ডূষে পান করুক। বাবার ইচ্ছেও অনেকটা তাই, তবে সঙ্গে ধর্মের একটু নুন ছিটিয়ে স্বাদু করা হয় যেন। মা বলেছিলেন, 'আর পড়ে ঘোড়ার ডিম হবে, দাও বিয়ে দিয়ে।' দাদা ডাক্তার অনিল বলেছিল, 'সায়েন্স পড়ুক সুনু, এটা বিজ্ঞানের যুগ।' সুনন্দার ইচ্ছে ছিল সাহিত্য পড়বার। কিন্তু—

অনতিবিলম্বে খাবার ডাক পড়ল। মা বললেন, 'খেয়ে নিয়ে আর বেশীক্ষণ পড়িস না যেন। অত রাত জাগা ঠিক নয়।'

পাশাপাশি বসে খাচ্ছিলেন বাবা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সুবৃহৎপরম-ধর্ম্মপুরাণ কেমন লেগেছে। প্রথমে অবিশ্যি একটু কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু ও হ'ল গিয়ে বেলফলের মত। একটু ভেতরে প্রবেশ করলেই দেখবে—অতি রসাল।'

খাওয়া সেরে ঘরে ফিরল সুনন্দা এবং অতি রসাল বইটির দিকে রুদ্র-রসাত্মক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সাপ্তাহিক একটি সচিত্র পত্রিকার ধারাবাহিক উপন্যাস পাঠে মন দিল।

কিছুক্ষণ বাদে দাদা ডাক্তার অনিলের আবির্ভাব হ'ল। টেবিলের ওপর একটা ওষুধের পেট মোটা বোতল রেখে বলল, 'এই নে তোর টনিক। দিনে দু'বার খাওয়ার পর দু'চামচ ক'রে। দুধ বা জল যা দিয়ে ইচ্ছে খেতে পারো। তবে দুধ দিয়ে খাওয়াই ভাল—একটু নিউট্রিশাস্ হবে। এতে আয়রন, ফসফেট্, ক্যালসিয়াম আর—'

'ওগুলো মুখস্থ করে আমার কি হবে দাদা?' করুণ কণ্ঠে বলল সুনন্দা।

ডাক্তার অনিল বোনের বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার স্বল্পতায় মর্মাহত হ'ল। বলল, 'এখন আছিস কেমন? শরীরটা কি খুবই খারাপ লাগছে?'

'না, ভালই আছি।'

'ছাখ সুনু, তোদের—আই মিন্ বাঙ্গালী মেয়েদের ব্যায়াম করা উচিত।'

'কাল থেকে ডন-বৈঠক-মুগুর চালাব।'

'নো, নো, আই ডোণ্ট মীন্ ছাট্। এই একটু যোগাসন করলি, একটু স্কিপিং—। ও হ্যাঁ, তোর জন্যে একখানা বই এনেছি—'কমন-ম্যান হাইজিন্।' এখানা খুব মন দিয়ে পড়বি।'

ব্যাগ থেকে নেমে 'কমন্-ম্যান হাইজিন্' এসে বসল সুবৃহৎপরমধর্ম্ম-পুরাণের পাশে।

ডাক্তার অনিল বলল, 'শুয়ে পড় সকাল-সকাল। রাত জাগা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। আমি বরং তোকে কাল খুব ভোরে ডেকে দেব।

সকালে ওঠা শরীরের পক্ষেও ভাল, মেমারীও ফ্রেস থাকে। সেই ভাল। শুয়ে পড়। ডেকে দেব আমি, কিচ্ছু ভাবনা নেই তোর।'

ডাক্তার অনিল' বিদায় হলেন। উপন্যাসের খণ্ডাংশটি সেরে শুতে যাবে ভাবছে, এমন সময় এলেন কাকা নরেন্দ্রনাথ। হাতে তাঁর একটা থান ইঁটের মত বই। বললেন, "এই বইটি পড়বে, মা সুনু। এতে একটি বিস্তৃত চ্যাপটার আছে তোমার ঐ ফেনোমেনালিজম্ সম্পর্কে। লেখক হচ্ছেন ভাসাখৎমাল্ন্। জার্মান পণ্ডিত। জার্মান বলেই তো ওঁর নামের আদ্যাক্ষর ডব্লুকে উচ্চারণ করলুম 'ভ'। হ্যাঁ আমি সংক্ষেপে ফেনোলেনালিজম্ সম্বন্ধে দুটো কথা বলে যাই। তারপরে তুমি পড়বে, সুবিধে হবে তাতে।'

'দুটো' কথা বলতে রাত একটা বাজল। সুনন্দার ঘুম আসছিল নরেন্দ্র-নাথের অনর্গল বাক্যস্রোতের মধ্যেও।

হঠাৎ নরেন্দ্রনাথ আঁতকে উঠে বললেন, 'অ্যা, সুবৃহৎপবমধর্ম্মপুরাণ কোঁথা থেকে এল? অ, দাদা দিয়েছেন বুঝি? নাঃ, মেয়েটার মাথা না খেয়ে আর ছাড়বেন না দেখছি। এটা অতি অর্বাচীন একটা পুরাণ—কি মূল্য আছে এর? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে হয়ত রচিত—একেবারে জাল পুরাণ। ছাখো সুনু. কোনটা প্রাচীন কোনটা অর্বাচীন, কোনটা খাঁটি কোনটা জাল এটা বুঝবার মত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি চাই সর্বাগ্রে। সব ব্যাপারেই চাই সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ্। নইলে—'

মা আর কাকীমা এলেন সুনন্দাকে উদ্ধার করতে। কাকীমা বললেন, 'মেয়েটাকে একটু ঘুমোতে দেবে, নাকি? চল শীগগির। মেয়েটাকে বই-চাপা দিয়েই তোমরা মেরে ফেলবে দেখছি। সমাজের দশটা লোকের সঙ্গে মিশতে শিখল না, কথা কইতে শিখল না, গুচ্ছের বই গেলাচ্ছ।'

মা বললেন, 'সমাজে মেশাটাই বড় কথা নয়, নিরু। বই গিলে-গিলে মেয়েটা হাড়গিলে হয়ে উঠল যে।'

কাকা করুণ স্বরে বললেন, 'বইটা তা হলে থাক সুনু তোমার কাছে, একটু দেখে রেখো। কালকে তোমার ঐ লজিকাল্ পজিটিভিজম্-টা ধরব।'

ভাসাখৎমাল্‌ন্‌ রইলেন পুরাণ ও হাইজিনের মধ্যখানে। আর মা-কাকীমা দু'পাশ থেকে কাকাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলে গেলেন আর সুনন্দা দুটো পাশ বালিশের মধ্যে তলিয়ে গেল অঘোর ঘুমে।

কিন্তু কতক্ষণের জন্যে! ভোর চারটের সময় যখন সুনন্দা একটা পাশ-বালিশকে আঁকড়ে ধরে গাঢ় ঘুমে নিমজ্জমান, তখন কর্তব্যপরায়ণ দাদা ডাক্তার অনিল জানালায় এসে হাঁক দিল, 'এই সুনু উঠে পড়। সকালে উঠে পড়বি বলেছিলি যে।'

পরদিন সুনন্দা আবার অমলকে বলল, 'উঃ, সত্যি, আর পারি না এই গার্জেনদের জ্বালায়।'

অমল ভীরু গলায় বলল, 'একটা উপায় খুঁজে পেয়েছি তোমায় রক্ষা করবার। যদি অভয় দাও তো বলি।'

'বল, এক্ষুনি বল।'

'আমরা বিয়ে করে ফেলি। এই একমাত্র উপায়।'

'ইস্‌! তার মানে বাবা, মা, কাকা, কাকীমা, দাদা সবার ক্ষমতা একার হাতে নিয়ে আমায় কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে ফেলতে চাও, তাই না? আমার ওপরে তোমার একচ্ছত্র ডিক্টেটরী চালাতে চাও, না?'

'এ তুমি কি বলছ, সুনন্দা?' ব্যথিত অমলের স্বর।

'থাক, থাক, ইনিয়ে বিনিয়ে মিষ্টি মিষ্টি আশ্বাস বাক্য শোনাতে হবে না। ও ছাড়াই তোমায় বিয়ে করব আমি।'

'সত্যি, সুনন্দা, আমি তোমায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেব।'

ধমক দিল সুনন্দা: 'ফের ঐ সব মিষ্টি মিথ্যে আশ্বাস!' মোটেও ভেবো না যে তোমার ঐ আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস ক'রে তোমায় বিয়ে করছি বা তোমায় ভালবাসি একথাও ভেবো না।'

'অ্যাঁ, তবে?'

'শত্রু কমাচ্ছি। পাঁচজন শত্রুর চেয়ে একজন শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা অপেক্ষাকৃত সহজ। বুঝেছ? এটা নেহাৎই একটা ষ্ট্র্যাটেজি।'

আত্মহত্যা মহাপাপ, শাস্ত্রে লিখেছে। কিন্তু আত্মহত্যার চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়া যে আরো কত বড় পাপ, জানতে হলে সুরবালার অভিজ্ঞতা-টা শোনা দরকার।

সুরবালা ভেবেছিলেন, আফিংয়ের ড্যালাটা খাওয়ার একটু পরেই তিনি এ শোক-তাপ-বিরক্তির পৃথিবী ত্যাগ করে স্বর্গলোকে পৌঁছে যাবেন। সেখানে খিধে-তেষ্টা নেই, দুঃখ-ব্যথা নেই, দীপার মত অবাধ্য মেয়ে নেই। কিন্তু এ কোন্ জ্বালা! প্রাণটা বেরবার আগে এমন বিশ্রী রকমের অত্যাচার করতে লাগল সুরবালার দেহের উপরে যে কহতব্য নয়। দেহ ছাড়তে দেহান্ত! দেহান্ত হওয়া কি চারটিখানি কথা! দেহ আর প্রাণে রীতিমত ধস্তাধস্তি। অবাধ্য দেহটা সুরবালার ইচ্ছাকে অবহেলা করে প্রাণকে কামড়ে ধরে পড়ে আছে। আর প্রাণ-বেচারা সেই মরণ কামড়ের সঙ্গে প্রাণপণ লড়েও পেরে উঠছে না। এই রাজ-যুদ্ধে উলুখাগড়া সুরবালার কী মর্মান্তিক অবস্থা! সুরবালা প্রতি মুহূর্তে আশা করতে লাগলেন যে এই বুঝি প্রাণটা এবার নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু নাছোড় দেহের জাঁতাকলে প্রাণটা আটকে গিয়েছে।

এমন সময় বাড়ির লোকের নজর পড়ে গেল বিস্ফারিত-চক্ষু সুরবালার উপর। মুহূর্ত দেরি না করে স্বামী ও দেওররা তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল হাসপাতালে। ডাক্তাররাও যেন সুরবালার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তৈরীই ছিল। কথা নেই বার্তা নেই, একটা রবারের না চামড়ার নল (ওমা, কী ঘেন্না, কিসের চামড়া কে জানে—গরুর, না মে'ষের।) হড়হড় করে গলার মধ্যে চালিয়ে দিল। ডাক্তারগুলো কী পাষণ্ড—একটু দয়ামায়া নেই! একটা লোক তার নিজের ইচ্ছেয় মরছে, তাতে তোদের কোন্ বাড়া ভাতটায় ছাই পড়েছে যে তোদের এত আদিখ্যেতা! মরে কি সুরবালা ডাক্তারগুলোর কাছে ভাত চাইত, না কাপড় চাইত।

সুরবালা ভাবছিলেন, আঃ এই সময় যদি প্রাণটা টুক করে বেরিয়ে যায়, তবে কী মজাই না হয়। ডাক্তাররা জব্দ হয়ে কেমন বোকা বনে যে যাবে। কিন্তু প্রাণটাও দেখা গেল সুরবালার দলে নয়, ডাক্তারদের দলে। ওরে বাবা এ আবার কী রে? নলের মধ্যে দিয়ে ডাক্তার কী যেন ঢালছে, আর বমির ধকলে সারা পেটটাই যেন উঠে আসছে সুরবালার। অসহায় তিনি। হাত-পা চেপে ধরা—নড়বার ক্ষমতাটুকুও নেই। এই অত্যাচারটা বেশ কিছুক্ষণ চালিয়ে গেল ডাক্তাররা। সুরবালার স্বামী লোকটাও তেমনি। স্ত্রীর ওপর এই ধরনের অশিস্ট ব্যবহার দেখেও বাধা দিচ্ছেন না। হাঁ করে তাকিয়ে আছেন সুরবালার দিকে। অত হাঁ করে দেখবার কী আছে বাপু এ মুখে! সেই শুভদৃষ্টির দিন থেকে ত দেখছ! "এ যাত্রা ফাঁড়া কেটে গেছে।" ঘোষণা করল ডাক্তার।

কী সর্বনাশ! সুরবালা তা হলে আবার মর্তালোকে ফিরে এলেন! কী লজ্জার কথা! এখন এ পোড়া মুখ নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরবেন কী করে! নাঃ, বাড়ি ফিরতে হলে সেই লজ্জাতেই তিনি মরে যাবেন।

ট্যাকসি এসে থামল বাড়ির সামনে। বাড়ির ত বটেই, আশপাশের লোকজনও—বিশেষত মেয়েরা—ভিড় করে এসে দাঁড়াল। যুদ্ধে পরাজিত বন্দীরানীর মত দশা সুরবালার। এই খানিকটা আগে পর্যন্ত এ বাড়ির সর্বেসর্বা ছিলেন তিনি। হঠাৎ যেন সিংহাসনচ্যুত হয়ে গিয়েছেন। সবাই অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কেউ বা হাসছে চাপা-ঠোঁটে। হাসপাতালে যাত্রার সময় দেহযন্ত্রণা সত্বেও বিজয়া বীরের মতই বেরিয়েছিলেন। জানতেন, এ প্রস্থান গৌরবের মহাপ্রস্থান। কিন্তু তখন কে জানত, পুনঃ-প্রবেশের বিধিলিপি তার ললাটে অতি বিশ্রীভাবে লটকে আছে। অসংখ্য চোখের দৃষ্টিবাণের শরশয্যায় শুয়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন।

দেওররা ভিড়টাকে ঘরের বাইরে রাখলেন। কারণ সুরবালা নাকি এখনও অসুস্থ, বিশ্রাম প্রয়োজন। তবু জানলায়-দরজায় ঝাঁকে ঝাঁকে চোখ অতি-অসভ্যের মত দাঁড়িয়ে রইল। সুরবালা যদি আগের সুরবালা

থাকতেন, তবে এতক্ষণে বাজখাঁই গলা হাঁকড়ে ওদের দূর করে দিতেন। কিন্তু সুরবালার গলায় ও বুকে আজ সে-জোর কোথায়! নিজ গৃহে যেন পরবাসী তিনি। নিজ দেহে প্রবাসী। গৃহ, দেহ—দুটোই ছাড়তে চেয়েছিলেন তিনি। আর ওরা দেখছে কেমন করে—রাগ ধরে না ওতে! যেন চিড়িয়াখানার একটা জন্তু দেখছে। সুরবালার কি দুটো শিং গজিয়েছে, না কি একটা ল্যাজ?

কিছুক্ষণ বাদে একটু ভিড় কমতে ঢুকলেন স্বামী। আর কী আশ্চর্য স্বামীকে দেখে এই বয়সে সুরবালার লজ্জা করতে লাগল। একেবারে সেই নববধূর লজ্জা। কিন্তু স্বামী সে-লজ্জাকে কিছুমাত্র মর্যাদা না দিয়ে বললেন, "ছি, বড় বউ, তুমি কিনা শেষে এই কাণ্ডটা করলে! লোক হাসালে তুমি এই বয়সে!"

"তা হাস গে যাও না তুমি। এখানে কাঁদুনি গাইতে কে বলেছে!" কথাটা বলে মুখ ঝামটা দিলেন সুরবালা। এবং বলতে নেই, বড় তৃপ্তি লাভ করলেন! স্বামীকে মুখ-ঝামটা দেওয়ার যে একটা অতি-বিশুদ্ধ, আদি ও অকৃত্রিম আনন্দ আছে, যা শুধু নারীই অনুভব ক'রে, এবং পুরুষ মাত্রেই যে-রসে বঞ্চিত,—সেই রসের উপভোগটুকু ত আছেই; উপরন্তু মুখঝামটা দেওয়ার বিদ্যায় সুরবালা অত্যন্ত পারদর্শিনী ছিলেন, সে-বিদ্যাটা যে আফিং-এর ডেলায় নেশাচ্ছন্ন হয়ে তালগোল পাকিয়ে যায়নি, বরং বেশ অক্ষত অক্ষুণ্ণ আছে, এটা জেনে সুরবালা এক গভীর তৃপ্তি লাভ করলেন। যাক্, বেঁচে ওঠার তবু একটা মানে হয়। ঐ বিদ্যে হারিয়ে বাঁচবার কোন অর্থ নেই সুরবালার কাছে।

স্বামী বললেন, "দীপা না হয় অশোককেই বিয়ে করল, ক্ষতি কী?"

"তুমিও এই কথা বলছ?" কণ্ঠস্বরে 'Thou too'এর আভাস।

"নয় কেন? মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবার সময় মনে ছিল না?"

"লেখাপড়া শিখেছে ত হয়েছে কী? চারটে ঠ্যাং গজিয়েছে?"

"চারটে ঠ্যাং নয়, একটা মগজ গজিয়েছে। তার মতামত না মেনে—"

"বিয়েও হবে তার মতে?"

"নিশ্চয়ই। সে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। যাকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পারে এখন। যদি জঙ্গল থেকে একটা বাঘকে কি বোসেদের ঐ গাইগরুটাকে বিয়ে করে ফেলে, আমরা বাধা দিতে পারি না।"
"কী বলছ তুমি? বাঘ? গরু?"
"আহা অশোক ত তার চেয়ে ঢের ভাল।"
"ভাল, না ছাই। ওদেরই জাতের। প্যাঁকাটির মত চেহারা।"
"তুমি খাইয়ে-দাইয়ে মোটা কর না—কে বারণ করছে!"
"আমার দায় পড়েছে।"
"প্যাঁকাটি ছাড়া অশোকের আর দোষ কী?"
"না, কোন দোষ নেই। একেবারে গুণনিধি। ও কুলীন?"
"কুল আজকাল আর কে দেখছে!"
"অমন করে দোষ কাটালে সবার সব দোষ কাটানো যায়। মেয়ে-সোহাগী! ওরা রেজেষ্টিরি করার আগে আমাদের মত নিল না কেন?"
"সেটা ভয়ে। আচ্ছা তুমি একটু বিশ্রাম কর। আমি উঠি।"
স্বামী যেতেই এল দীপা। সুরবালা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। দীপা কাঁদতে সুরু করল—সশব্দে। ফোঁস ফোঁস শব্দ যত বাড়ে, তত সুরবালার মুখও এদিকে ঘোরে। দীপা কেঁদে হেঁচকি তুলে ফেলেছে। একটি মাত্র মেয়ে!
দীপা বলল, "মা, তোমার যখন মত নেই, আমি অশোকের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দেব।"
দীপাকে চমকে দিয়ে সুরবালা চিৎকার করে উঠলেন, "অলুক্ষনে মেয়ে, কে তোমাকে এত কর্তাতি করতে বলেছে? কে তোমায় বিয়ে ভাঙবার মত দিয়েছে—আমি দিয়েছি? তোমার বাবা দিয়েছে? হিন্দু ঘরের মেয়ে না তুমি? স্বামী কি মাটির পুতুল? ভাঙবে আর গড়বে? বেরিয়ে যাও চোখের সামনে থেকে। যদি বিয়ে ভাঙার কথা আর বলেছ তবে সত্যি-সত্যি এবার বিষ খেয়ে মরব। এবারে কম খেয়েছিলুম বলে ডাক্তার ঠেকাতে পেরেছেন, সেবারে আর সে-চালাকি খাটবে না।"

দীপার চোখে জলের বদলে ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি।

হঠাৎ স্বামী ঢুকে বললেন, "দীপু, তোর মার চাদরটা একটু ঠিকঠাক করে দে ত। পুলিশ আসছে।"

ও মা! সে কী কথা! আবার পুলিশ! একবার ডাক্তার জেরা করেছে হাসপাতালে। এবার খোদ পুলিশ! সুরবালা দুনিয়ায় দুটি জিনিসকে অত্যন্ত ভয় করেন—ভূত আর পুলিশ। আর ইদানীং দীপাকেও ভেতরে-ভেতরে একটু ভয় পেতে শুরু করেছেন।

মেজ দেওরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে একজন দারোগা ঢুকল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল দুজন কনস্টেবল। এ দৃশ্য দেখলে কারও বুক ধড়ফড় না করে পারে!

"আপনার নাম?" দারোগার গুরুগম্ভীর গলা।

প্রাক-বিবাহ যুগে মেয়ে-দেখার পরীক্ষা দিয়েছেন সুরবালা একাধিকবার। এই প্রৌঢ় বয়সে আবার সেই রকম পরীক্ষা—বোধহয় আগেরটার চেয়েও শক্ত। কোনরকমে বললেন, "সুরবালা দেবী।"

"আপনি আফিং খেয়েছিলেন?"

কী জ্বালাতন! ঐ এক কথা ঘুরে-ফিরে! সুরবালা খেয়েছেন, বেশ করেছেন, আরও খাবেন, হাজার বার খাবেন। অন্যের মুখে ত খেতে যাননি, বা চুরি করেও খাননি যে এত জেরা সহ্য করতে হবে! মুখে বললেন "হাঁ, খেয়েছিলুম।"

"কেন?"

"এমনি।"

"সে কি! এমনি কেউ বিষ খায় নাকি!"

"ইচ্ছে হয়েছিল তাই।"

"হঠাৎ এমন ইচ্ছে হল কেন?

"খিদে পেয়েছিল।" ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে সুরবালার কণ্ঠস্বর।

"দেখুন, অন্য কথা বলে এড়াবার চেষ্টা করবেন না। আমরা জানি, আপনার মেয়ে আপনাদের মতের বিরুদ্ধে একটি ছেলেকে—"

হ্যাঁ, তা হয়েছে কী ?" একটু চড়া সুরেই বললেন সুরবালা। ঘরের কথা বাইরে আলোচিত হোক তা তিনি চান না।

"সেই মতবিরোধই আপনার এই ইয়ের কারণ বলে আমরা শুনেছি।"

"শুনেছেন, বেশ করেছেন। তা আমি কী করব ?"

"না—মানে—আপনার এ সম্বন্ধে আর কিছু বলবার আছে কিনা ?"

"না, নেই।"

"আচ্ছা, আমরা কয়েকটা প্রশ্ন করছি, উত্তর দিন। আপনাকে কেউ জোর করে আফিংটা খাইয়েছে কি ?"

সুরবালা যেন অপমানিত এমনি স্বরে বললেন, "কার এত সাধ্যি !"

"না, মানে, যেমন ধরুন, আপনার মেয়ে—"

দারোগার মুখ থেকে কথা ছিনিয়ে নিলেন সুরবালা : "কে ? দীপা ? আপান কি পাগল ?"

"না, না, তা নয়। আমি বলছিলুম, আপনি তা হলে স্বেচ্ছায় বিষ খেয়েছেন—আত্মহত্যার চেষ্টায় ?"

"হ্যাঁ, খেয়েছিলুম। বেশ করেছিলুম। আবার খাব। তাতে আপনার কী ? আমি আমার মুখে খেয়েছি আপিং—আপনার মুখে নয়।"

সত্যি, প্রতিভা কোন দিন চাপা থাকে না। সুরবালার ভয় প্রথম দিকে কিছুক্ষণ তাঁর বাক-প্রতিভাকে রুদ্ধ করে রেখেছিল। এবার জিভের ডগায় স্বয়ং সরস্বতী নৃত্যশীল হয়ে উঠলেন।

"দেখুন সুরবালা দেবী, আইনের চোখে নিজেকে বা অপরকে খুন করা একই অপরাধ। আপনি নিজেকে খুন করতে চাইলে সেটা আইনের চোখে অপরাধ।"

"একদম বাজে আইন। এ ত আর পরকে মারছি না। নিজেকে যা খুশী তাই করতে পারি।"

"না, আইনত আপনি নিজেকে মারতে পারেন না।"

"এ আইন নিশ্চয়ই তা হলে এই কন্‌গ্রেসের আমলে হয়েছে। কোম্পানির আমলে এমন বিতিকিচ্ছিরি আইন ছিল না।"

দারোগা বলল, "আচ্ছা, কাল সকালে এসে আপনার সঙ্গে আর একবার কথা বলব। এখন আপনি বড় উত্তেজিত রয়েছেন।"

দারোগা বেরিয়ে গেল। তার জুতোটা রাজকীয় মর্যাদায় ঘচং ঘচং শব্দ তুলল। স্বামী-দেওররা পুলিশের মোসাহেবের মত ভঙ্গিতে সঙ্গে গেল। সুরবালা রাজেন্দ্রাণীর মত শয্যা-সিংহাসনে নিজেকে মেলে দিলেন।

একটু পরে স্বামী এসে বললেন, "কত টাকার ধাক্কা কে জানে!"

"কেন? কিসে—?"

"তোমার কর্মের গুনগার। মামলা হবে ত!"

"ও বাবা. সে যে নানা হাঙ্গামা!"

"হ্যাঁ। কোর্টে টানাটানি করবে।"

"কোর্ট! এত ঝামেলার চাইতে যে মরাও ভাল ছিল। আমায় বাঁচালে কেন তোমরা?"

এরই মধ্যে এসে হাজির হলেন বালীগঞ্জের দিদিশাশুড়ী। বৃদ্ধা এসেই গালে হাত দিয়ে অতি-অবাক ভঙ্গিতে খন-খন শব্দে চিৎকার করে উঠলেন, "হ্যাঁ লা সুরো, তোর মনে এই ছিল? তুই কিনা শেষে আত্মহত্যে করলি?"

আচ্ছা, এতে রাগ হয় না কার! জলজ্যান্ত মানুষটা ভোঁস ভোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে, প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে আছে, আর বলে কিনা আত্মহত্যা করেছে

"দেখছেন ত জলজ্যান্ত বেঁচে আছি। আত্মহত্যা করলুম কোথায়?"

"ঐ একই কথা হল। জুতো মারাও যা, জুতো মারব বলাও তা। আত্মহত্যে করাও যা, আর আত্মহত্যের জন্যে আপিং খাওয়াও তা। হ্যাঁ রে, তোর মনে এই ছিল? তুই কিনা শেষে আমাদের 'খোকা'কে এমন করে পথে বসাবি? হা রে পোড়া অদেষ্ট!"

কান্নাসুরে বিলাপ করতে লাগলেন দিদিশাশুড়ী।

অনেকক্ষণ বিলাপ করে বিদায় নেবার আগে বলে গেলেন, কাল সকালে বালীগঞ্জের ওঁদের বাড়ির সবাই সুরবালাকে দেখতে আসবে।

তারপরে দেখা গেল যে স্বামী-দেওর-ভৃত্য-পত্র-টেলিফোন মারফত শুধু ঐ খবরই আসছে, কলকাতার যত আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু সবাই কাল সুরবালাকে দেখতে আসবে। কাল বুঝি রবিবার! সিনেমা, থিয়েটার, আড্ডা, নেমন্তন্ন, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা ইত্যাদির যাবতীয় কর্মসূচী বাদ দিয়ে সবাই এখানে আসবে—সুরবালাকে দেখতে। মিছিলের পর মিছিল আসবে, শত শত মানুষ, হাজার হাজার চোখ। সেই চোখে হাসি, ঠাট্টা, আরও কত কিছু। না, সুরবালা এ সহ্য করতে পারবেন না। সত্যি, আত্মহত্যা মহাপাপ। কোন সন্দেহ রইল না। মহাপাপ না করলে মানুষকে এমন নাকাল হতে হয়! তবে এই মুহূর্তে তাঁর আত্মহত্যার চাইতে পরহত্যার প্রেরণাই বেশী জাগছে। কিন্তু জীবন কি এই সব মহৎ প্রেরণার মূল্য দেয়! সুরবালা চোখ বুজে পড়ে রইলেন। ভগবান কানটা বোজাবার মত ব্যবস্থা কেন রাখেননি!

নাঃ, এভাবে তিনি দুর্বল ভীরুর মত ঐ শত শত লোকের দৃষ্টি ও বাক্যের কাছে বলি হতে পারবেন না। তারও পরে নাকি আবার আছে পুলিশ, কোর্ট, শাস্তির ভয়। এর চেয়ে মরা ভাল। আর একটা আপিং-এর ডেলা খেয়ে সব কিছু থেকে মুক্তি। হাজার চোখ আর পুলিশকে জব্দ করবার এবং সুরবালার আত্মরক্ষার এর চেয়ে ভাল উপায় আর নেই। আত্মহত্যাই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।

রাত একটু গভীর হলে সুরবালা বিছানায় উঠে বসলেন। একটু ক্লান্তি লাগছে। কিন্তু তিনি শাশুড়ীর ঘর পর্যন্ত গিয়ে একটা আপিং এর ডেলা গিলতে পারবেন। আর তারপরে কে পায় তখন সুরবালাকে! কিন্তু এবারেও যদি তিনি ব্যর্থ হন, তবে এই বিড়ম্বনা দশগুণ বাড়বে, আর ওদিকে মামলা—আতঙ্কে শিউরে উঠলেন সুরবালা।

শুয়েই পড়তে হল তাঁকে অগত্যা।

ঘুম থেকে যখন উঠলেন, তখন সদরে পুলিশ ও অন্দরে কয়েক শ চোখ পৌঁছে গিয়েছে। কাল রাতে ও-চোখগুলো বোধহয় সারাক্ষণ সজাগ ছিল।